কমলাকাণ্ডের পত্র

To talk of many things
Of shoes and ships and sealing wax
Of cabbages and kings.

১৩৩৪

রামেশ্বর এণ্ড কোং

চন্দননগর

প্রকাশক

শ্রীচারুচন্দ্র রায় এম্-এ,

চন্দননগর।

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

আশ্বিন, ১৩৩৪

দাম দু টাকা চার আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাণী প্রেস,

৩৩এ, মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণের ৩০খানির উপর আরও ২৩খানি পত্র সন্নিবেশিত হইল—তন্মধ্যে "যদি" ও "দূর নাহি দেখতা" "ভারতবর্ষে" ও অবশিষ্ট "আত্মশক্তি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। মানুষের কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি না-ও হইতে পারে, কিন্তু পুস্তকের কলেবর বড় হইলে মূল্য বাড়িতে বাধ্য—সুতরাং মূল্য বাড়িল।

সমালোচক কমলাকান্তকে ঝাঁটার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—সে ঝাটার যতই প্রয়োজন হউক, কাহারও গায়ে লাগিলে "ষাট্ ষষ্টির দাস" বলিতেই হয়; সম্মার্জ্জনীর হাওয়াও যার গায়ে লাগিবার সম্ভাবনা আমি তাহাকে অগ্রেই বলিয়া রাখিতেছি—"ষাট ষেটের বাছা!"

প্রকাশক

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

যার "মুখবন্ধ" লেখবার কথা ছিল তার মুখ এখন বন্ধ; আমি শুধু এই পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হব যে, "কমলাকান্তের পত্র" এই নামে প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক ভাবে "নবসঙ্ঘ" ও "আত্মশক্তি" পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল; একটি "নিবন্ধ" পত্রেও প্রকাশিত হয়। পর পর যেমন ছাপা হয়েছিল, এ পুস্তকে প্রবন্ধগুলি সেই পর্য্যায় রক্ষা করেই ছাপা হ'ল, কোন প্রকার ওলটপালট বা পরিবর্ত্তন করা হয়নি।

"মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে"—কমলাকান্ত সম্বন্ধে খোসনবীশ জুনিয়ার প্রদত্ত এ সংবাদটা সত্যও হতে পারে; কিন্তু সে মরেনি এটা ঠিক। যুগে যুগে সে বেঁচে থাকবে—আর তার বক্তব্য তারই মতন করে বলে' যাবে, তার ভুল নেই।

This fellow's wise enough to play the fool ;
And, to do that well, craves a kind of wit.
He must observe their mood on whom he jests
The quality of persons, and the time ;
And *not* like the haggard, check at every feather
That comes before his eye. This is a practice,
As full of labour as a wise man's art :
For folly, that he wisely shews, is fit ;
But wise men folly-fallen quite taint their wit.

—*Twelfth Night. Act 3. Scene 1.*

The people whose hearts are always aching
are the ones who joke most.

—*Mother by Maxim Gorky.*

সূচীপত্র

১।	প্রসন্ন গোয়ালিনীর বাড়ী পূজা	১
২।	বিজয়া	৫
৩।	স্বপ্নলব্ধ রক্ষাকবচ	৮
৪।	মেকি	১৪
৫।	আঁটকুড়ী	১৯
৬।	সেবা	২৬
৭।	অহিফেন ব্রত	৩২
৮।	"বাবা মেয়ে"	৩৯
৯।	পাগলের সভা ...	৪৪
১০।	খোদার উপর খোদকারী	৫১
১১।	আবিষ্কার না বহিষ্কার	৫৭
১২।	নিরুপদ্রবী	৬২
১৩।	যেহেতু আমরা ভাই ভাই	৬৬
১৪।	সাবধান!	৭০
১৫।	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপন	৭৬
১৬।	ঐহিক ও পারত্রিক	৮৩
১৭।	বাস্তু	৮৮

সকলেই বেশী দেখে ; আর দুধে অনেক জল ঢেলেচ বা অনেক জলে দুধ ঢেলেচ, তাতে পয়সা করেচ কি না তা জানি না—তবু না হয় একবার মা'র পূজা কল্লে—তাতে ক্ষতি কি, পূজার পুণ্যি আছে ত ?" প্রসন্ন রাগিয়া বলিল—"তুমিও আমার পয়সা দেখচ, হা কপাল !" তখন আমি বল্লাম—"তবে এক কাজ কর, ঠাকুরখানার ত এখনও মুণ্ড বসেনি, ওটা একটা কাঠামই ধরিয়া লও—ওটাকে উনানজাত করিয়া ফেল, আপদ মিটে যাক !"—প্রসন্ন বল্লে, "তা কি হয় ?"—আমি বল্লাম —"এ-ও না ও-ও না—পূজো কর্ত্তেও ইচ্ছে আবার না-কর্ত্তেও ইচ্ছে, এতে আর আমি কি বলি বল।" প্রসন্ন বল্লে—"আমার যখন ইচ্ছে হয় তখন করবো, লোকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে জোর করে' পূজো করাবে এ কি কথা ?"—তখন আমি বল্লাম, "দেখ প্রসন্ন তুমি গয়লার মেয়ে সে তত্ত্বকথা তুমি বুঝবে কিনা জানি না—তবে আজকালকার সব পূজাই একরকম ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া পূজা বা ফেলা পূজা ; তোমার পাড়াপড়শি তোমার বাড়ী ঠাকুর ফেলে দিয়ে গেছে, আরসব না হয় তাদের পূর্ব্ব পুরুষরা তাদের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে গেছে এইমাত্র প্রভেদ,—মা'র রূপ, মা'র শক্তি, মা'র ঐশ্বর্য্য সম্যক হৃদয়ে ধারণ করে' মা'র আরাধনার কাল বহুদিন বাংলা দেশ থেকে চলে' গেছে, তা তুমি আর দুঃখ কর' না—ভক্তিভরে পূজা করগে, তোমার গয়লা-বংশ উদ্ধার হয়ে যাবে। তবে একটা কাজ কর্ত্তে হবে, একবার উকিল বাড়ী যেতে হবে—"

প্রসন্ন আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"পূজা করব ত উকিল বাড়ী যাব কেন ?—পুরুত বাড়ী বলছ বুঝি।"

আমি বল্লাম—"না না, আমি নেশার ঝোঁকে কথা কইচি না,

উকিল বাড়ীই যেতে বলছি।” প্রসন্ন হাঁ করে’ রইল—আমি বল্লাম, —“হাঁ করে’ থেক’ না, মুখটি বুজে’ আমি যা বলি তা কর—এরাজ্যে পূজার প্রথম ব্যবস্থা উকিল-মোক্তারেই করে’ থাকে, তারপর পূজারীর কাজ সম্ভব হয়।” তখনও হাবা গয়লার মেয়ে বোঝে না, বল্লে, “উকীল বাড়ী পূজার ব্যবস্থা ত এই আমি নূতন শুনলাম।” আমি বল্লাম—“কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী—প্রসন্ন, যে রাজ্যের যে ব্যবস্থা, আর যে কালের যে রীতি, দশপ্রহরণধারিণী মা আমার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তোমার বাড়ী বিদেশ বিভুঁই থেকে আসবেন—তার একটা পয়ার করে’ না রাখলে শেষে বিপদে পড়বে।”

“তোমার কথাবার্ত্তা আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি না” বলে’ সে গালে হাত দিয়ে বসে’ রইল। আমি বল্লাম—“প্রসন্ন, তুমি যদি এত সহজে আইনের কথা বুঝতে পারতে তা’হলে আইন করাই যে বৃথা হ’ত—তা বুঝচ না। বুঝিয়ে বলি শোন—এই যে দেশটি দেখচ, যার একদিকে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী আর তিনদিকে পগার তোলা—এইটা দেশ, আর এর বাইরে যে বিশাল বাংলা দেশটা পড়ে’ আছে সেটা বিদেশ, সুদূর হিমালয়ের ত কথাই নাই ;—সেই দূর হিমালয়-গৃহ থেকে যে মা নেমে তোমার বাড়ীতে আসবেন, তিনি ত বিদেশিনী বলেই পরিগৃহীতা হবেন—এই দেশে প্রবেশাধিকার লাভ কত্তে হলে তাঁর একটা ছাড়-পত্র চাই ; তারপর তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে’ আসবেন, বিশ জনের অধিক হলেই ত আইনের খেলাপ হয়ে যাবে। তার উপর আবার তিনি দশপ্রহরণ দশহাতে ধারণ করে’ আসবেন, অস্ত্র-আইনের মধ্যেও পড়তে পারেন, এ সকল জটিল কথার মীমাংসা করবার জন্য একবার উকিলের বাড়ী যেতেই হবে।

আমি। কোন্‌টা নির্জ্জন মনে হচ্ছে ঠিক বুঝতে পাচ্ছ কি? —মনের ভিতরটা, না ঘরের ভিতরটা?

প্রসন্ন। কি জানি! আমার ছেলে নাই মেয়ে নাই—আঁচল দিয়া প্রতিমার চরণ যখন মুছাইয়া লইলাম, তখন আমার বুকের ভিতর যে কি রকম করিয়া উঠিল, তাহা আমি বলিতে পারি না—যেন আমারই মেয়ে আমার গৃহ শূন্য করিয়া স্বামীর বাড়ী চলিয়া যাইতেছে। সে কষ্ট কেমন তাহা, আমি মা নই, ঠিক বলিতে পারি না, তবে আমার মনে হয় ঐ রকমই। আমার মনে হইল, মা'র চোখেও যেন জল দেখিলাম! পাড়ার মেয়ে শ্বশুরঘর করিতে চলিয়াছে, মা'র চোখে জল, মেয়ের চোখে জল, দেখাদেখি আমারও চোখে জল আসিয়াছে, কিন্তু এমনতর কষ্ট তো তখন হয় নাই। এখন বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সব যেন শূন্য মনে হইতেছে।

আমি। এতগুলা টাকা যে বাজে খরচ হইয়া গেল, প্রসন্ন! সেটা কি একবারও মনে হচ্ছে না?

প্রসন্ন। মোটেই না। আমার মনে হইতেছে টাকা দিয়া কেনা যায় না এমন একটা-কিছু ভাগ্যক্রমে পাইয়াছিলাম, আজ তাহা হারাইয়াছি, আর বুঝি তা কখনও ফিরিয়া পাইব না।

আমি মনে মনে এই মাতৃপূজার প্রবর্ত্তক মহাপুরুষকে কোটি কোটি প্রণাম করিলাম। বলিহারি তোমার রচনা। এই 'আভাঙ্গা' গয়লার মেয়ের মনকে কি আশ্চর্য্য উপায়ে তোমার শিক্ষা-পদ্ধতি তার এই দুনিয়ার চূড়ান্ত ঐশ্বর্য্য ধনসম্পদের আবিল আবর্ত্ত হইতে উত্তোলন করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের দিকে তুলিয়া লইল; এ গয়লার মেয়ে স্বল্পকালের জন্যও তোমার অদ্ভুত সৃষ্টি-কৌশলে এমন এক

কথা—শরীর-মনের দেবতা যদি ঔষধ গ্রহণ করিলেন ত ঔষধ ফলিল—আর না গ্রহণ করিলেন ত সব ঔষধ ভাসিয়া গেল। তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া ঔষধ গ্রহণ করান যখন মানুষের সাধ্য নহে—তখন মাদুলিও যা আর বিজ্ঞানসম্মত ঔষধও তাই। প্রসীদ প্রসীদ বলে' জীবনদেবতাকে প্রসন্ন কর, আর মাদুলি পর—এই প্রকৃষ্ট উপায়।

প্রসন্ন। তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি না—মিছে রাগ করিয়াই বা কি করি বল—প্রসন্ন হতাশ হইয়া বসিয়া রহিল।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম—প্রসন্ন, যাদের দেশে বিজ্ঞান রসায়ন ইত্যাদির বহু স্ফুরণের ফলস্বরূপ গতযুদ্ধে শত শত লোক মরিল—তাহাদের দেশে প্রতিদিনের কার্য্যে, গৃহস্থলাতে, সমাজে, রাষ্ট্রীয়-ব্যাপারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে, বেচাকেনার মধ্যে কত টোটকা, পদক, রক্ষাকবচ, Mascot ব্যবহার হয় তা তুমি জান? তুমি একেবারে বিজ্ঞানভক্ত বিদুষী হইয়া উঠিয়াছ, মানুষ যতদিন না সর্ব্বশক্তিমানের যুড়া হইয়া উঠিতেছে, ততদিন এসব চলিবেই চলিবে, তা কি তুমি জান? রোগ হইলে ডাক্তার ডাক—আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই, ডাক্তারটা একটা চল্‌তি রক্ষাকবচ মাত্র, রোগমুক্ত হওয়া-না-হওয়া যে দেবতার অনুগ্রহ, তাঁহার সহিত পরিচয় ডাক্তার বাবুর নাই, তবে তিনি উপস্থিত হইলে তুমি বেশী একটু বল পাও, একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পার এইমাত্র; সব টোটকার উদ্দেশ্যও তাই—তোমাকে বল দেওয়া, ধৈর্য্য দেওয়া, দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবার অধ্যবসায় দেওয়া ইত্যাদি।

প্রসন্ন এতক্ষণ হাবুডুবু খাইতেছিল, এখন একেবারে তলাইয়া গেল, কোন্ দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একেবারে চুপ হইয়া গেল।

আমি বলিলাম—"প্রসন্ন. অমন চুপ করিয়া থাকা ত তোমাদের স্বধর্ম্ম নহে, যা-হয় একটা-কিছু বল, নহিলে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যাই।" প্রসন্ন একেবারে মুখে ওলপ দিয়াছিল।

আমি বলিলাম—প্রসন্ন, দেখ তোমার বিজ্ঞানসম্মত ঔষধ দেওয়ায় বিপত্তিও আছে—অনেক সময় চিকিৎসাবিভ্রাটও হয়, বিপরীত চিকিৎসাও হয়—মাদুলি বা টোটকায় সে আশঙ্কা একেবারেই নাই। লাগিল যদি ত দৈবানুগ্রহে একেবারে রাতকে দিন করিয়া দিল—আর না লাগিল যদি ত কোন আশঙ্কা নাই। বিরুদ্ধ কিছু হইবার আশঙ্কা মোটেই নাই। একটা বিজ্ঞানের ঢেউ আসিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশ সনাতন ধর্ম্মের দেশ, অনেক ঢেউ কাটাইয়া আমরা আজ তিন হাজার বৎসর বাঁচিয়া আছি—এ ঢেউটাও কাটাইয়া উঠিব। এই দেখনা সমগ্র দেশটায় যে অহজম রোগ ধরিয়াছে, ভালমন্দ কিছুই পরিপাক হইতেছে না—দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তাহার বিজ্ঞানসম্মত ঔষধ প্রয়োগ করিতে গিয়া যখন বোমা ফাটিল তখন একে আর হইয়া দাঁড়াইল। এখন দেশের মাথা যাঁরা, তাঁরা সকলেই বুঝিলেন যে বিজ্ঞান সম্মত হইলে কি হয় ওটা আমাদের ধাতুসম্মত নহে, অতএব পরিত্যজ্য। সে পথ ত্যাগ করিয়া দেশের রাজাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈলাক্ত করিয়া (constitutional agitation) কার্য্য হাসিল করিবার ধূম পড়িয়া গেল—তাহার ফলে নূতন কাউন্সিল গড়িয়া উঠিল, তাহাও আজ মাকাল ফল বলিয়া পরিত্যজ্য মনে হইতেছে, যে হেতু সেটাও আমাদের শরীর ধাতুর (constitution) অনুকূল নহে। কিন্তু এইবার যে পথ আবিষ্কৃত

তাকে বল্লাম, হ্যাগা তোমার এসব লক্ষ্মীছাড়া খাবার কেউ কেনে? সে বল্লে, 'বাবু জন্মালে মৃত্যু আছেই, ও-গুলা লক্ষ্মীছাড়াই হ'ক আর লক্ষ্মীমন্তই হ'ক যখন জন্মেচে তখন মরবেই।' তোমাকেও তাই বলি জন্মালে মৃত্যু আছেই ; এ আজব দুনিয়া ; যখন টাকাটি জন্মেছে, আর চলে' চলে' এতদূর এসেছে, তখন আরও অনেক দূর যাবেই।

তবে মেকিকে মেকি বলে' সত্য সত্য জানলে আর চলে না। মেকি বলে' জেনেচ কি অচল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মেকি বা মায়া বলে' বুঝেছ কি আর বিশ্বপ্রপঞ্চ তোমার কাছে না-থাকার সামিল ; তুমি যে-মুহূর্ত্তে টাকাটাকে মেকি বলে' সন্দেহ করেচ অমনি তোমার কাছে সেটা আর টাকা নয়, টাকার রূপ থাকলেও সেটা টাকা ছাড়া আর-কিছু।

এখন কথা হচ্চে টাকাটি তোমার কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছিল কি প্রকারে। হয় কেউ মেকি জানিতে পারেন নাই নচেৎ না-জানার ভান করিয়াছেন, আর সাচ্চা টাকার দলে মিশাইয়া অন্ধকারে চালাইয়া দিয়াছেন। এই রকম করিয়া তোমাকেও চালাইতে হইবে। এই রকম করিয়া কত বড় বড় মেকি চলিয়া গেল। গেলিলিও অঙ্ক পাতিয়া জানিলেন যে পৃথিবী স্থিরা নহেন ; কিন্তু যতক্ষণ না তাহা না-জানার ভান করিলেন, ততক্ষণ তাঁর অন্ধতমসাচ্ছন্ন কারাগৃহ হইতে অব্যাহতি হইল না। পৃথিবী অচলা এই বিশ্বাসের ভান করিবামাত্র তিনিও আলোর মুখ দেখিলেন, আর চিরদিনের মেকি মতটাও চলিতে থাকিল।

তোমরা যে টিপ পর, কাজল পর, পাতা কাট, আল্‌তা পর, গহনা পর, রঙীন শাড়ী পর—এটা কতখানি মেকি চালাইবার সরঞ্জাম

মত ধেই ধেই করতুম? আচ্ছা আমাকে বল দেখি—তোমার ক'টি ছেলে?

প্রসন্ন। একটিও না।

আমি। ক'টি মেয়ে?

প্রসন্ন কর্কশ-কণ্ঠে বলিল—একটিও না—তা বলে' কি আবাগীরা আমাকে অাঁটকুড়ী বলবে? ছেলে-মেয়ে হওয়া-না-হওয়া কি মানুষের হাত?

আমি। হাত যারই হ'ক, হয়নি যখন তখন হয়েছে বলা ত আর চলে না? তোমাকে কেউ যদি পুত্রবতী, জেয়ঁচ বলে—সেটা তুমি গালি বলে' না নিলেও বিদ্রূপ বলে' নিতে ত? বিদ্রূপ ত গালাগালিরই ছোট ভাই। সেইটাই বা কি করে' সহ্য করতে?

প্রসন্ন। তাই বা বলবে কেন?

আমি। তবে কি বলবে? ছেলে হয়েছে ত বলবে না, হয়নিও বলবে না! তোমার একটা স্বরূপ বর্ণনা ত আছে?

প্রসন্ন। তুমি যেমন ন্যাকা! ছেলে হয়নি আর অাঁটকুড়ী বুঝি এক কথা?

আমি। ঠিক এক কথা নয় বটে; হয়নি বলে' তুমি যেন একটু ছোট, যেন একটু অপরাধিনী, অভাগিনী; আর যিনি বলেচেন, তাঁর ছেলে হয়েছে বলে' তিনি একটু বড়, একটু ভাগ্যবতী, এইটে যেন তিনি তোমাকে স্পষ্ট করে' বুঝিয়ে বলেচেন, এইত? কিন্তু গোড়াকার কথাটা ত সত্য?

প্রসন্ন। সত্যি হলেই বুঝি সব হ'ল? বলার কি একটা ধরণ নেই?

আমি। ধরণ আছে বৈ কি? কিন্তু ধরণটা চাঁচাছোলা করবার জন্যে ত আর সত্যটাকে ডুবিয়ে দেওয়া চলে না।

প্রসন্ন। তা বলে' কানাকে কানা, আর খোঁড়াকে খোঁড়া বলে' তাদের মনে কষ্ট দেওয়া বুঝি তোমার শাস্ত্র?

আমি। না তা নয়, খোঁড়াকে দেখলেই—ওরে খোঁড়া, আর কানাকে দেখলেই—ওরে কানা বলে' সম্বোধন করতে হবে, তা বলচি না; কিন্তু তাদের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ধরণের খাতিরে কানাকে ত পদ্মলোচন, আর খোঁড়াকে গিরিলঙ্ঘনকারী বলা চলে না। সেটা বিদ্রূপও বটে অসত্যও বটে।

প্রসন্ন। তা বলে' কাটখোট্টার মত কেবল লোকের বুকের উপর দিয়ে চাবুক চালালেই বড় বাহাদুরী হয়, না? লোকে চোয়াড় বলবে না?

আমি। হয়ত বলবে। কিন্তু লোকে যদি বিচার করে' দেখে ত দেখবে, সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত দুনিয়া বিনীতদের হাতে যত ঠকেচে চোয়াড়দের হাতে তার সিকির সিকিও ঠকে নি, চোয়াড়দের চিনতে, তাদের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে, আবশ্যক হ'লে তা হ'তে আত্মরক্ষা করতে, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না; কিন্তু বিনীতের মোলামত্বের অতলস্পর্শ ভেদ করতে গিয়ে অধিকাংশ সময়েই হাবুডুবু খেতে হয়, অনেক সময়ে তলিয়ে যেতে হয়। আমি বিনীতদের বড় ভয় করি—তারা বিনয়ের chloroform দিয়ে আমার কোন মর্ম্মস্থলে ছুরিখানি বেমালুম চালিয়ে দিয়ে বসবে, আমি জানতেও পারব না। সরলতাই যাদের বিনয়, তাদের কথা বলছি না। সাধারণতঃ বিনয় মানে, সবটা না-বলা বা বিষম ঘুরিয়ে বলা;

প্রসন্ন। মেয়েমানুষকে বিয়েই করতে হবে, আর ছেলে বিয়োতেই হবে, তারই বা মানে কি ?

আমি। প্রসন্ন, আমার মত বুড়ো ভূশুণ্ডীকে আর ও-প্রশ্ন কর' না ; অর্ব্বাচীনদের ও হেঁয়ালি বলে' ধাঁধা লাগাতে চেষ্টা কর'। সাত পাক্ দিয়ে বিয়ে করতে হবে কি না হবে, সেটা সমাজ বুঝবেন ; কিন্তু মেয়েমানুষকে বিয়ে করতেই হবে—তা সাত পাকেই হ'ক, বিনি পাকেই হ'ক, আর বিপাকেই হ'ক। আর যতদিন পুরুষের উরুদেশ ভেদ করে' সন্তানের জন্ম, ও তর্জ্জনী হ'তে দুগ্ধক্ষরণ উপন্যাসের পৃষ্ঠা হ'তে নেমে এসে এই বাস্তবজগতে সত্য হ'য়ে না উঠবে, ততদিন মেয়েমানুষকে ছেলে বিয়োতেই হবে, আর ওটা একমাত্র তাদেরই কৃত মধ্যে পরিগণিত থাকবে।

প্রসন্নর চোখ তখন আবার জলে ভরিয়া উঠিল।

সে বলিল—তবে কি যার ছেলে হ'ল না সে একেবারে দুনিয়ার বার হ'য়ে গেল ? অনেক পুত্রহীনা কত সদাব্রত, কত দেউল, কত পুষ্করিণী করে' দিয়েছে, তা'তে কি লোকের উপকার হয় নি ? কত পুত্রহীনা নারী ধর্ম্মের পথে, লোকহিতের পথে, কত কীর্ত্তি রেখে গেছে সেগুলা কি অপুত্রক বলে' ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয় ?

আমি। তা কেন ? এই তুমি, আঁটকুড়া হয়েও বা হয়েচ বলেই, এই যে নিরালম্ব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করছ, তাতে কি আমার উপকার হচ্ছে না, না তোমারই পুণ্য সঞ্চয় হচ্ছে না ? যদি ক্বচিৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে—আমার এই দিগন্তবিস্তৃত বিদগ্ধ জীবন-মরুপ্রান্তরে তুমি যে ফলহীন রসাল, একক আমার মাথার উপর রৌদ্রে শিশিরে পল্লবাস্তরণ বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তার

একেবারেই বিচলিত হয় নাই। ফেলা-ঠাকুরের পূজা যেন তাহার মৌলিক প্রথাই হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রত্যেক পূজাটাই সে খুব সমারোহের সহিত করিয়াছিল, গ্রামসুদ্ধ লোককে ভূরিভোজনে পরিতুষ্ট করিয়াছিল। হঠাৎ তাহার কষ্টার্জ্জিত পয়সার প্রতি সে কি জন্য এত নির্ম্মম হইয়া উঠিল তাহা বুঝা গেল না; তবে ইহা বেশ বুঝা গেল সে যে ঠিক কত পয়সার মালিক চোরেও তা'র সন্ধান পায় নাই নতুবা এই ঘোরান উপায়ে তাহার সংকার করাইতে হইত না।

কিন্তু এত করিয়াও পাড়ার লোকে প্রসন্নকে নিশ্চিন্ত হইতে দিল না। যে সকল ষণ্ডামার্ক যুবকদের দল তাহার প্রতিমা পূজায় সহায়তা করিয়াছিল—মেরাপ বাঁধিয়া, তালপাতার ঘর করিয়া দিয়া, রন্ধন পরিবেশন ইত্যাদি ভূতের মত, রাত নাই দিন নাই, খাটিয়া ঠাকুর-সেবার সহায়তা করিয়াছিল—তাহারা এখনও প্রসন্নকে ছাড়ে না—বলে, তাহাদের একদিন ভাল করিয়া না সেবা লইলে তাহার সব পূজা পণ্ড, পাঠ পণ্ড, লোক-সেবা পণ্ড; যেহেতু তাহারা না থাকিলে তাহার এত করিত কে?

মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি, অর্থাৎ স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত নয়। অতএব আমি আফিংএর মৌতাতেই থাকি আর সজ্ঞানেই থাকি, আর আমার দ্বারা তাহার পরিত্রাণ সম্ভব হউক আর না হউক, প্রসন্নর মাথা আটকাইলেই আমার কাছে ছুটিয়া আসিবেই আসিবে। তাই দুধ দিবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তাহাকে আসিতে দেখিলেই আমি বুঝিতাম—প্রসন্নর মাথা আটকাইয়াছে।

ঠিক-দুপুর বেলা প্রসন্ন এক পাল পাড়ার ছেলে লইয়া আমার উঠানে আসিয়া উপস্থিত।—ব্যাপার কি?

সেবার এই ব্যবস্থা করলুম, সেটা কি প্রকাশ্যভাবে,—পৃথক করে' —পরিস্ফুট করে' স্বীকার করা উচিত নয় ?

প্রসন্ন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। আমি বলিলাম—সেবাকার্য্যের সবটাই তোমরা করেছ—এই তো তোমাদের কথা ? কিন্তু মনে কর, প্রসন্ন যদি প্রথম খড়-জড়ান মূর্ত্তিটা উনানের ভিতর দিত, তা হ'লে তোমাদের দেশসেবার অবসর কোথা থাকত বাপু ? প্রসন্ন যদি তার মুখে-রক্ত-ওঠা-পয়সা একটিও না ছাড়ত, তা হ'লে শুধু উঠান চেঁচে, সেই উঠানে উপবিষ্ট অতিথির মুখে সবুজ ঘাস আর মাটির ডেলা ভিন্ন কি দিতে বাপু ? গয়লার মেয়ের কি সুবুদ্ধিটা তোমরা দিয়েছিলে ? তার মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলে একটি একটি করে' রোজকার করা টাকা যদি জলের মত সে ঢেলে না দিত, তবে তোমরা সুধুহাতে অষ্টরম্ভা ছাড়া আর কি কা'কে খাওয়াতে বাপু ? আর দেশের লোকের সঙ্গে কি পরিচয়ই হ'ত বাপু হে ? অতএব পরিস্ফুট করে' যদি কিছু স্বীকার করতে হয়, তবে আগে স্বীকার কর—প্রসন্নর হৃদয়, প্রসন্নর অর্থদান, প্রসন্নর ত্যাগ। তারপর পরিবেশন ও পরিচর্য্যার কথা তুলো। সেটা ভাড়াটে রাঁধুনি বামুনের মেয়ের দ্বারাও হ'ত। একজন কেবল পাকা ভাণ্ডারীর ওয়াস্তা বৈ তো নয় ? আর হাঁড়ির খবর নিতে যদি সত্য সত্যই ব্যগ্র হ'য়ে থাক, তা হ'লে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে ত সে কাজ করতে পার। তা'র জন্য ত বাবা, এত উঠান চাঁচার দরকার নেই—অত জল বেড়াবেড়ি করবার দরকার নেই।

৩য় যুবা। আপনি বলেন কি ? ভাড়াটে লোক দিয়ে দেশসেবা ? Horror of horrors !

আফিমের যে কি শক্তি তা আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় গভর্ণমেণ্ট বেশ জানেন ; আসাম তরাইএর দুর্দ্দান্ত নাগা কুকী প্রভৃতি জংলী-গুলোকে, বৎসর বৎসর আফিম সওগাৎ দিয়ে, বেশ শান্ত শিষ্ট করে' রেখেছেন ; তাদের পশুবুদ্ধি গিয়ে তারা লক্ষ্মী হ'য়ে আফিম খাচ্ছে আর ঝিমুচ্ছে। পঞ্জাব সীমান্তে পাঠানগুলোকে এখনও আফিম ধরাতে পারেন নি বলে', তারা সেই ইতিহাসের অরুণোদয়ের সময় যে পশুবৎ ছিল এখনও তাই আছে ; ছোট ছোট আফিমের গুলিতে যে শুভকার্য্য সম্পন্ন হ'ত, বড় বড় কামানের গোলাতেও তা হচ্চে না ; তারা যে-জংলী সেই-জংলীই র'য়ে গেছে—ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত ভারতবর্ষীয় মেষের পালের উপর পড়ে' নিয়তই হাঙ্গামা বাধাচ্চে। চীনেরা যতদিন বেশ নির্ব্বিবাদে আফিম সেবন কচ্ছিল ততদিন কেমন নির্ব্বিবাদে সুড় সুড় করে' সব ইউরোপীয় পাদরী, ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' ইউরোপীয় বণিকসঙ্ঘ চীনের সমুদ্রতীরে, চীনের main artery ইয়াংসি নদীর উভয় পার্শ্বে, ভাল ভাল জায়গাগুলি দখল করে' বসবার অবসর পেয়েছিলেন ; কেননা তখন চীন ছিল অহিংস ও অহিফেনসেবী। এখন চীন আফিং কিছু কম খাচ্চে ও সেই সঙ্গে কিছু কম অহিংস হ'য়ে উঠেছে ; Boxer rebellion থেকে সুরু করে' হিংসা বেড়েই চলেছে—foreign devilগুলোকে আমল দিতে বড় রাজী হচ্চে না।

কিন্তু গোড়ায় গলদ হ'য়ে গেছে ! এমন নির্ব্বিরোধী মোলায়েম জিনিষটার কিনা নাম রাখা হ'ল—অহিফেন। নামে কি এসে যায় যে বলে, সে নাম-রূপের গূঢ় মাহাত্ম্য ছাইও বোঝে না। What is in a name ; a rose under another name will smell

আর জাতিবিচার বা ছুৎমার্গ—এসব যে কোথায় তলিয়ে যাবে ডুবুরি নাবিয়ে তার খোঁজ পাওয়া যাবে না। তার আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্চি। আমি একবার রেলে চড়ে' নসীরামবাবুর দেশে পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম। আমার পূজার নিমন্ত্রণ অর্থে অহিফেনের ভূরি সেবনের নিমন্ত্রণ; কেননা মৌতাতী লোকের শক্তিপূজার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকতে পারে না। আমার সঙ্গে আমার দপ্তর, আর দপ্তরের ভিতর আমার আফিমের কৌটাটা; ষ্টেশনে যখন গাড়িখানা দাঁড়াল, আমার ঠিক খেয়াল ছিল না; যখন গাড়িটা ছাড়-ছাড়, আমার সংজ্ঞা হ'ল, আমি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। গাড়িখানা চলে' গেলে, আমার হাতটা খালি খালি বোধ হ'তে লাগল; তখন মনে করে' দেখি, আমার আফিমের কৌটা-সমেত দপ্তরখানা গাড়িতে রয়ে গেছে! বলা বাহুল্য আমার দপ্তরের জন্য মোটেই দুঃখ হ'ল না, যেহেতু যে-মাথা থেকে দপ্তরের লেখা বাহির হয়েছিল তা আমার স্কন্ধেই ছিল। কিন্তু আফিমের কৌটার জন্য আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! আমার তখন খোয়ারির সময় নয়, কিন্তু কৌটাটা হাতছাড়া হওয়ায়, আমার তখনই হাই উঠতে লাগল। সে যে কি হাই উঠা, আর কত বড় হাই উঠা, তা যে অহিফেনসেবী নয়, সে বুঝতে পারবে না; রাবণের রথ গেলবার জন্য জটায়ুও ততবড় হাঁ করে নি। আমি বড়ই বিপন্ন হ'য়ে পড়লাম। সে অজ পাড়াগা, সেখানে কি দয়াময় সরকার বাহাদুর পাড়াগেয়ে ভূতেদের জন্য আফিমের দোকান খুলেচেন? কোথায় যাই, কি করি! এমন সময় এক নধরদাড়িযুক্ত মুসলমান ভদ্রলোক (যাঁর পূর্ব্বপুরুষ হয়ত, যে চতুর্দ্দশ অশ্বারোহী বক্তিয়ার খিলিজির সঙ্গে

"বাবা মেয়ে"

"সখি! নাহি জানত সোহি পুরুষ কি নারী।" এক্‌থা কবিতায় বেশ শুনায়; কিন্তু পুরুষকেই বল আর রমণীকেই বল, বাস্তব-জীবনে, এ সন্দেহাভাস অলঙ্কারের মধ্যে যে ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে, পুরুষ বা নারী তা বরদাস্ত করতে পারে না। পুরুষকে রমণী আর রমণীকে পুরুষ বল্লে, উভয়ের পক্ষেই ব্যাজস্তুতির বিপরীতই বুঝিয়ে থাকে। সোজা কথায়—মেয়েমুখো পুরুষ আর মদ্দা মেয়েমানুষ এ দুটা কথাই গালাগাল।

মানুষ অর্থাৎ পুরুষ মানুষ নারীকে, অবলা, দুর্ব্বলা, weaker vessel, ইত্যাদি উপাধি দিয়ে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু নারী, নারী হিসাবে, কোনদিনই অবলাও নয়, দুর্ব্বলাও নয়, weaker vesselও নয়। আমি প্রবলা, হরবোলা, হিড়িম্বা বহুত দেখেছি। তবে ও-সকল খেতাব যে নারীকে দেওয়া হয়েছে তার ভিতর একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে। পুরুষ নারীকে যা করতে চায় বা যেরূপ দেখতে চায় তদনুরূপ উপাধিই দিয়ে থাকে। 'নাই' বল্লে শুনেছি সাপের বিষও থাকে না। তোমার বল নাই, বুদ্ধি নাই, তেজ নাই ইত্যাদি শুনতে শুনতে নারী বাস্তবিকই অবলা, দুর্ব্বলা হ'য়ে যাবে

যে, নারীর মাতৃত্বের বিকাশ না হ'লে বা তার অবকাশ না পেলেই, সে পুরুষের কোটে এসে জুড়ে বসতে চায়,—Suffragette হয়, politician হয়, সমাজ-সংস্কারক হয়, ঘর ও বাহিরের মধ্যে যে প্রাচীর, তা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য হাতিয়ার সংগ্রহ করতে থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে তার বক্ষে শিশু মা বলে' তার মাতৃত্বকে জাগিয়ে তোলে, তখন তার পুরুষত্বের দাবী (যাকে সে মনুষ্যত্বের দাবী বলে' মনে করে) কোথায় ভেসে যায়। লণ্ডনের পথে পথে যখন Suffragetteরা হৈ হৈ করে' অতি অশোভনভাবে তাদের মনুষ্যত্বের দাবী ঘোষণা করে' গগন ফাটাচ্ছিল, আমি বলেছিলাম—হে ইংরাজ, মা সকলকে ঘরবাসী কর, স্বামীর সোহাগ আর সন্তানের মুখচুম্বনের ব্যবস্থা করে' দাও, মা সকলের মাতৃত্বের অমিয় উৎস খুলে দাও, মা-সকল আপনার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, পথ দেখিয়ে দাও। কিন্তু ইংরাজ-সমাজ সেদিকে গেল না। তার উপর লোক-বিধ্বংসী সমরবহ্নি তাদের যৌন-সংহতি লেহন করে' নিয়ে গেল ; সে ব্যবস্থা আরও সুদূরপরাহত হ'য়ে গেল। তাই আজ নারীর নারীত্বের নামে পুরুষের স্বাধিকার মধ্যে হানা পড়ে গেছে। তার ঢেউ এখানেও এসে পৌঁছেচে।

আমি দেখেচি বিলাতে যেমন স্বামী মিলে না বলে' স্ত্রীগণ পুংধর্ম্মী হ'য়ে উঠে ; আমাদের দেশে স্বামী মিললেও যেখানে স্বামী-সুখ মিলল না, বা সন্তানের কাকলিতে গৃহদ্বার মুখরিত হ'য়ে উঠল না, প্রায় সেই-খানেই মনটা হঠাৎ বহির্মুখ হ'য়ে উঠে, হাল ফ্যাসানমত কথায় দেশসেবা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদির দিকে মনটা ছুটে বেরিয়ে পড়ে। প্রসন্নর একটি বিড়াল আছে, সে কখন কখন আমার দুধে ভাগ বসায়, সেটাকে প্রসন্ন বড় ভালবাসে ; প্রসন্নর সে মার্জ্জারপ্রীতি, আমি বুঝতে পারি,

আর সহজের মধ্যে ব্যবধান, কৈশোর আর যৌবনের মধ্যে ব্যবধানের মত—সূক্ষ্ম ও অপরিজ্ঞেয় ; কখন্ কৈশোর গিয়ে যৌবন এলো যেমন ধরা যায় না, সহজ মানুষ কখন্ পাগল হ'ল ঠিক সে সন্ধিক্ষণ অন্তর্য্যামী ভিন্ন কেহ বুঝতে বা জানতে পারে না। কে পাগল আর কে সহজ তা'ও ঠিক ধরা কঠিন। যুক্তি, ন্যায় বা তর্ক শাস্ত্রের আইন, চোখ চেয়ে অমান্য করলে যদি মানুষকে পাগল বলতে হয়, তা হ'লে নসীরাম বাবুর কার্য্যের সকল সমালোচকই পাগল ; যেহেতু তাঁরা সকলেই, কার্য্যমাত্রের কারণানুসন্ধানরূপ মনুষ্য হৃদয়ের প্রবলতম স্পৃহার বশবর্ত্তী হ'য়ে, ন্যায়ের মাথায় পদাঘাত করে', এক একটা মনগড়া অনুমান খাড়া করে' নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ; সে অনুমানের পশ্চাতে না ছিল যুক্তি না ছিল প্রমাণ। পাগলামী জিনিষটাই এত জটিল বা স্থিতিস্থাপক যে কাহাকেও পাগল বা সহজ বল্লে, সর্পে রজ্জুভ্রম হ'ল কি না বলা কঠিন।

নসীরাম বাবুর রবিবারের অতিথিদের মধ্যে কতকগুলি, যা'কে লোকে সচরাচর পাগল বলে, সেই পাগল ছিল ; কেহ কেহ আমাকেও সে দলভুক্ত করত। তথাকথিত সহজ ভিখারী বা ভিখারিণীগণ চলে' গেলে নসীরাম বাবু তবে পাগলগুলিকে ভিক্ষা দিতেন, এবং তাদের নিয়ে একটু রঙ্গরস করতেন ; ভিক্ষার শেষে নসীরাম বাবুর উঠানে একটি পাগলের সভা বসত বল্লে ভুল হয় না। সে সভার সভাপতি স্বয়ং নসীরাম বাবু, আমি দর্শক বা reporter মাত্র। আমি এক রবিবারের সভার proceedings report করছি।

নসীরাম বাবু। কি হে মাখন, কেমন আছ ?

মাখন অন্যমনস্ক ভাবে একটু হাসিল মাত্র। মাখন কোমরে

কাপড় না পরে' গলায় কাপড় পরে ; সে বলে কোমরে কাপড় জড়ালে অনেকখানি কাপড় বাজে নষ্ট হয় ; গলায় কাপড় পরলে, অল্প লম্বা কাপড়েই চলে,—মিছে বাজে খরচ কেন ?

নসীরাম বাবু। মাখন, সে দিন বাজারে মেছুনী মাগী তোমার গায়ে জল দিয়েছিল কেন হে ?

মাখন। আজ্ঞে, মেছুনী বেটী বলে আমি উলঙ্গ, আমার কোমরে কাপড় নেই বলে'। আমি বল্লাম, বেটী কোমরে কাপড় নেই ত কি হয়েছে, আমার দেহটা ত ঢাকা আছে ? বেটী তবুও বলে,—পাগলা, তোর গায়ে কাপড় থাকলে কি হয়, তুই ও-কাপড়ের ভিতর নেংটা। আমি বল্লাম—বেটী, তোর কোমরে কাপড় থাকলে কি হয়, তুইও কাপড়ের ভিতর নেংটা ! বেটী আমার গায়ে আঁস জল দিলে—বেটী পাগলী !

রতনা পাগলা ততক্ষণ একটু করা ইট নিয়ে নসীরাম বাবুর সান বাঁধান উঠানের খানিকটা লিখে লিখে ভরিয়ে দিয়েছে।

নসীবাবু। রতন কি লিখছ ?

রতন। আজ্ঞে বেটা জমীদার জমীদারই আছে ; রামা কেওরার উপর কি অত্যাচারটা করেচে বলুন দেখি ! বেটাকে হাজতের হুকুম দিলুম, আর ৩০৪ ধারা মতে তার উপর নামলা চালিয়ে দিলুম।

নসীবাবু। গ্রামের জমীদার হাজার হ'ক, তার অত করে' নিগ্রহ করলে—ভাল করলে কি ?

রতন। ভালমন্দ কিছু নেই ; তা বলে' আপনি যেন তার হ'য়ে সাক্ষী দেবেন না ; বিপদে পড়বেন বলে' দিচ্চি।

নসীবাবু। আরে তা কি আমি করি ! তুমি যখন দাঁড়িয়েছ

নসীবাবু। মধু, আজ গঙ্গাস্নানে যাবে না ?

মধুসূদন দাস, জাতিতে মুচি, বললে—"বাবু, আমাকে রাগাবেন না"; সে কিন্তু তার আগেই রাগে গর্‌গর্ করতে সুরু করেচে।

নসীবাবু। চট কেন, মধুসূদন ? এত লোক গঙ্গাস্নান করে, পতিতপাবনী গঙ্গা, গঙ্গায় নাইবে না ত কোথায় নাইবে ?

— মধু। এজ্ঞে, তা জাননা ? বাবু, ছাস্তর জাননা ? শোন, হদে লাইবে, লদে লাইবে, পকুরে লাইবে, ডোবায় লাইবে, পাতকোয় লাইবে, দামোদরে লাইবে, রূপলারাণে লাইবে,—গঙ্গায় লাইবে না, ছরস্বতীতে লাইবে না, পদ্মায় লাইবে না,—মেয়ে মানুষকে মাথায় করবে ? ছ্যাঃ—

নসীবাবু। মধু, গঙ্গা যে মহাদেবের জটায় ছিলেন তা জান ত ? মহাদেব কেমন করে' মাথায় কল্লেন ?

মধু। পিরীতে, পিরীতে—

মাখন মধুসূদনের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ; মধুর কথা শেষ হ'লে "পাগল রে" বলে' হেসে উঠল।

আমি কিন্তু এই ব্যক্তি চতুষ্টয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পাগল ও সহজের সীমানির্দ্দেশ করতে পারলুম না। লোকে এই লোকগুলোকে কেন পাগল বলে, আর তারা নিজেই বা কিসে সহজ, তার বিচার আমি করতে অক্ষম। প্রচলিত চিন্তাস্রোতের যারা উজানে যায় তারাই পাগল, আর সেই স্রোতে গা ভাসান দিয়ে যারা আরামে ভেসে চলে তারাই সহজ, একথা কেহ স্বীকার করবে না। গড্ডলিকাবৃত্তি পরিত্যাগ করে' নূতন পথ আবিষ্কার করতে গেলে বা

পর্য্যন্ত দগ্ধ হ'য়ে গেল। বক্তার পর বক্তা উঠে বলতে লাগলেন—নাটককারের নাটকগুলি চমৎকার, বঙ্গসাহিত্যের রত্নভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম রত্নস্বরূপ; তাঁর অভিনয়নৈপুণ্যও অদ্ভুত—কিন্তু, নাটক ছেড়ে নাটককারের কথা ভাবলে, হৃদয়ে অনুশোচনা আসে, দুঃখ হয়;—নাট্যকার হিসাবে এতবড় হ'লেও মানুষটা এত হীন মনে হ'লে লজ্জা হয়।

আরে আমার লজ্জাবতী লতা! প্রভুদের এই sanctimonious scruples, এই ছুঁচিবাই দেখে, আমি হাড়ে হাড়ে জ্বলছিলুম—কেন আমি বক্তৃতা করতে শিখি নাই, তা হ'লে বাক্যের বন্যায় এই খড়কুটা আবর্জ্জনাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কালাপানিতে পৌঁছে দিতুম; অথবা যদি বাহুতে বল থাকত, ত টাউনহলের থামগুলোকে আলিঙ্গনে চূর্ণ করে', Samsonএর মত নিজেও চাপা পড়ে' মরতুম—এ অমানুষগুলোকেও চাপা দিয়ে মারতুম। তা হ'ল না; যেহেতু আমি সুধুই কমলাকান্ত মাত্র। নিন্দাস্তুতির অতীত হ'লেও, মুক্ত আত্মার তর্পণের জন্য একটা কথাও বলতে পারলুম না বলে' আমার চোখে জল এল।

কিন্তু এত বড় সভায় কি একটা মানুষ নেই—সবাই কি নিরিমিষ্যি আতপ তণ্ডুল ও অপক্ক কদলীভোজীর দল—এমন কেউ নেই যে বলে—হে পণ্ডিতম্মন্যগণ, এ অবিভাজ্য বিভাগ কি হিসাবে কর? এ যে অদ্বৈত, লেখের অন্তরালে লেখক, সৃষ্টির অন্তরালে স্রষ্টা, প্রকৃতির অন্তরালে পুরুষ! একটা দূর করে' দিলে কি আর একটা টিঁকে? রাখ তোমার ছুঁচিবাই, তোমার শবব্যবচ্ছেদ। এমন সময় এক দিব্যজ্যোতি যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান হ'য়ে সেই বিশাল কক্ষতল কম্পিত করে' গর্জ্জে উঠ্‌ল,—'গিরিশ বাবুকে ভগবান একটা অখণ্ড মানুষ করে'

আবিষ্কার না বহিষ্কার

কত হাজার বছরের কথা—মাটির ভিতর এক রাজার কবর, কবরের ভিতর মণিমাণিক্য খচিত এক স্ফটিকের পেটারি, তার ভিতর রাজার নশ্বর দেহ—কত স্নেহের, কত ভক্তির, কত সোহাগের সৌরভে ভরপুর। এক দিন পেটের দায়ে মাটি কাটচে এক চাষা, কোদালের কোণ ঠং করে' লাগল সেই কবরের গায়; চাষা খুঁড়ে চলল, ভাবলে এইবার যক্ষের ধন বুঝি মিলল; খুঁড়ে বা'র করলে সেই স্ফটিকের পেটারি, খুলে ফেললে তার ডালা—কি অপূর্ব্ব সৌরভ, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সে সহস্র বৎসরের ঘুমন্ত রাজার, কি অপূর্ব্ব জ্যোতি সে মণিমাণিক্যের—কিন্তু দেখতে দেখতে সে সৌরভ উপে গেল, রাজার ঘুমন্ত মূর্ত্তি উপে গেল, মণিমাণিক্য ধূলায় পরিণত হল; স্পর্শ করবার আগেই, আলো লেগে, বাতাস লেগে, চাষার লুব্ধদৃষ্টি লেগে যেন সব গলে' গেল, বাতাসে মিশিয়ে গেল। চাষা যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখলে মাত্র!

পেটের দায়ে না হ'ক—আর পেটের দায়ে নয়ই বা কেন? একটু ঘুরিয়ে দেখলে, পেটের দায়েই—পুরাতন কবর খুঁড়ে পুরারত্ন বা'র করবার বড় ধুম পড়ে' গেছে। টাটকা কবর খুঁড়ে মড়া বা'র করে' যারা উদরস্থ করে, তাদের বলে ghoul. Ghoul এক রকমের প্রেতযোনি, আধা মানুষ আধা ভূত। পুরাতন কবর যারা খোঁড়ে

'কন্তু সে কথা স্পষ্ট করে' বল, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করব। আর আবিষ্কার করলে যদি স্বত্বই জন্মায়, আমি বলব আবিষ্কার করা ব্যবসাটা ছাড়! এ তোমার মাটি খুঁড়ে কয়লা আবিষ্কার করা নয়; নিয়ে যাও তুমি কয়লা, নিয়ে যাও তুমি সোনা, আর তাঁবা, আর লোহা, আর টিন—তা'তে ভারতবর্ষ গরীব হবে না; কিন্তু আবিষ্কার আর পুরাতত্ত্বের নামে কবর খুঁড়ে মহাপুরুষের অস্থি—আর মন্দির হ'তে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি,—মন্দিরগাত্র হ'তে অপূর্ব্ব চিত্র আর কারুশিল্পের নিদর্শন জাহাজে বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেও না, তা'তে ভারতবর্ষের যে দীনতা আসবে তার সীমা নাই; ঐ অস্থি, ঐ প্রতিমূর্ত্তি, ঐ শিল্প-মহিমা ভারতকে একদিন প্রাচ্যদেশের তীর্থস্থান করেছিল, ভবিষ্যতের সে সম্ভাবনাকে একেবারে অসম্ভব করে' দিও না।

লর্ড কর্জ্জনের আইন পুরাবস্তুকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেচে; পুরাবস্তু অর্থে মাটির উপর বা গুহার মধ্যে যা কিছু দৃশ্যমান; সেগুলিকে নষ্ট করার বা বিকৃত করার প্রতিষেধক কতকগুলি আইন-কানুন হয়েচে। তা'তে কবর খুঁড়ে অস্থি বা ভক্তগণ-স্থাপিত মূর্ত্তিকে, স্থানচ্যুত করে' গুদামজাত করার কোন প্রত্যবায় হয় নি। ভারুটের বৌদ্ধস্তূপের বিচিত্র শিল্প-সম্পত্তি কলিকাতার যাদুঘরে জমা করা দেখলে, চিৎপুরের ট্রামের ঘর্ঘর, বেচা-কেনার কোলাহল কচ্‌কচি, ধূম ও ধূলার অন্ধকারে, খাঁচার ভিতর বন্দী কোকিল বা পাপিয়ার কণ্ঠস্বর মনে পড়ে; মুক্ত বাতাস, মুক্ত আকাশ থেকে বঞ্চিত করে' যে হৃদয়হীন তাকে চিৎপুরের জাফ্রিঘেরা বারান্দার ভিতর পিঞ্জরবদ্ধ করেচে তাকে অভিসম্পাত করতে ইচ্ছা করে। আমার মনে হয় বন্দী পাখীগুলোর মত বন্দী পাথরগুলোর প্রাণ আর্ত্তনাদ করচে! তাই আমি বলি

"নিরুপদ্রবী"

অহিফেন প্রসাদাৎ আমি বহুদিন যাবৎ প্রায় সকল বস্তু, ব্যক্তি ও ব্যাপারের সঙ্গে অসহযোগ এবং খুব নিরুপদ্রব অসহযোগ করে' বসে' আছি ; কেবল একটি জিনিষের সঙ্গে করি নাই, কেননা করিতে পারি নাই, সেটি প্রসন্নের মঙ্গলা গাইয়ের দুধ। এবং আমার বিশ্বাস যতক্ষণ দুধে হাত না পড়ে, ততক্ষণ নির্ব্বিবাদে অসহযোগ নীতি খুব নিরুপদ্রব ভাবেই অনুসরণ করা চলে। পেটে খেলে পিটে সয় ; কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে সেই প্রাণধারণের উপায়ীভূত দুধ বা ভাত বা দুধ-ভাতের উপর কেহ উপদ্রব আরম্ভ করে, তখন আর উপদ্রুত ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নিরুপদ্রব থাকা চলে না। যদি সে নিদারুণ অবস্থাতেও সে বা তারা নিরুপদ্রব থাকে, তবে বুঝতে হবে যে সে বা তারা সব উপদ্রবের বাহিরে গিয়ে পড়েছে অর্থাৎ গতাসু হয়েছে।

বার্ণহার্ডির War is a biological necessity-মন্ত্রের উপাসক জার্ম্মাণ জাতি ফরাসির ঠেলার চোটে মন্ত্রটাকে পাল্‌টে নিয়ে Non-violent non-co-operation is a logical necessity এই নূতন রূপ প্রদান করায় আমার বড় আনন্দ হয়েছিল ; আমার নিরুপদ্রব অসহযোগনীতি যে কতখানি প্রসারলাভ করল তা ভেবে আমার মনে গর্ব্ব অনুভব করেছিলাম ; কিন্তু তখন একবার ভেবে দেখবারও

যে হেতু আমরা ভাই ভাই

যে হেতু আমরা ভাই ভাই—রাঢ়ীর সঙ্গে বারেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ, মনের ভিতর বেশ তফাৎ করে' রেখেচি, যদিও মুখে খুব ভদ্রতা করে', অর্থাৎ চালাকি করে' বলি—আমরা ভাই ভাই।

যে হেতু আমরা ভাই ভাই—ছত্রিশ জাতের খোপের ভিতর পুরে' ভাইগুলিকে বেশ শ্রেণীবদ্ধ করে' রেখেছি ; খোপের বা'র হ'য়ে ভাইটি আমার খোপের দিকে এসেছেন কি অমনি চঞ্চুর আঘাতে তাঁকে দূর করে' দিয়ে বলি—"খোপের মাহাত্ম্যটা না মানলে সমাজ ছড়িয়ে পড়বে, খোপটা আছে বলেই আমরা আছি, নহিলে কবে আমাদের এই পারাবত গোষ্ঠিকে বেরালে শেষ করে' দিত, অতএব খোপের বাহিরে আসিও না।" মাথার উপর যে বাধাহীন আকাশ বলচে—আমি আছি, আমি বাধাহীন বলেই তোমরাও আছ, সে অশরীরী বাণী—খোপের ভিতরে বসে' শুনেও শুনচি না। ভাই ভাইএর জীবনস্রোতের অবাধ প্রবাহে যতকিছু বিঘ্ন সৃজন করতে পারি, তা বেশ বুদ্ধি করে' সৃজন করেচি—শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে তাকে আষ্টেপিষ্টে শৃঙ্খলিত করেচি।

যে হেতু আমরা ভাই ভাই—বেহারী ভাই বরাকর নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলচেন, প্রবেশ নিষেধ—Behar for the Beharees ; উড়িয়া ভাই বৈতরণীর তীরে দাঁড়িয়ে বলচেন—Orissa

অতএব এস যৌবন, এস রাজপুত্র, এস ভিখারী, এস জ্ঞান, এস মমতা, তোমাকে আমি এ ভারতভূমির মহিমাময় যুগে দেখেছি, আবার তোমার আগমন প্রতীক্ষা করে' বসে, আছি—এস, এস। ভাইএর সঙ্গে ভাইএর মিলন ঘটিয়ে দাও—কারণ আমরা যে সত্যই ভাই ভাই। ভয়ঙ্করের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভীত ভীতের হাত ধরে' ভরসা পায়, নির্য্যাতনের চোটে মানুষে মানুষে মিল হয়, উদরের জ্বালায় লোকে একজোট হয়; কিন্তু যেমন ভয়ের কারণ দূরে যায়, নির্য্যাতনের জ্বালা প্রশমিত হয়, উদরের জ্বালা নেভে, তখন আর কেউ কা'কেও চেনে না, তখন আবার মানুষ নিজ মূর্ত্তি ধরে, মুখে বলে ভাই ভাই, মনে মনে ছুরি চোকাতে থাকে। তাই ডাকছি তোমাকে, হে রাজপুত্র! তুমি যে জ্ঞান যে মমতা নিয়ে মানুষের ভিতর সুধু মানুষটাকে দেখেছিলে, দেখিয়ে দিয়েছিলে—যে জ্ঞানের মহিমায় জাতি বর্ণ দেশ কাল সব ভুলে গিয়ে, মানুষ আপনার মানুষত্ব ফুটিয়ে তুলেছিল—সেই জ্ঞান ও মমতা নিয়ে, হে রাজপুত্র, হে ভিখারী, আর একবার এসো, এসো—দেখিয়ে দাও আমরা সত্যই ভাই ভাই।

২৫শে চৈত্র, ১৩২৯

আর একবার জাতের মাথা খেয়ে ছিলেন বুদ্ধদেব, যিনি আমাদের দশ অবতারের এক অবতার। বুদ্ধদেব লোকটা বড় জবরদস্ত ছিলেন, —হাজার হোক রাজার ছেলে ত! চাতুর্ব্বর্ণ্য নষ্ট করে' দেশটার খুব উন্নতি হয়েছিল শুনিচি; কিন্তু ধর্ম্মটা একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল। দেশ উন্নত হ'য়ে ত কোন লাভ নেই, ধর্ম্ম নষ্ট হ'লে যে পরকাল নষ্ট হ'ল, তার হিসাব ত কেউ রাখে নি! তাই শঙ্করাচার্য্যের উদ্ভব হ'ল; তিনি আবার নষ্ট জাত উদ্ধার কল্লেন; হিন্দুধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ল, বৌদ্ধধর্ম্ম বাপ্ বাপ্ করে' "চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপানে" গিয়ে আশ্রয় নিলে; যে যে দেশে বিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম্ম গিয়ে আশ্রয় নিলে, সেগুলো আজ পর্য্যন্ত স্বাধীন, (ব্রহ্মদেশ মাত্র কাল পরাধীন হয়েচে) আর আমরা হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই লাথির পর লাথি, আর জুতার পর জুতা খাচ্চি; কিন্তু বদ্ধজীব আমরা, আমাদের বুঝা উচিত, আমাদের পরকালটা কি রকম পাকা হ'য়ে গেছে, আর ইহকালে কি অমূল্য নিধি আমরা লাভ করেচি—"চাতুর্ব্বর্ণ্যে"র স্থলে আমরা "ছাত্রিশবর্ণ্য" পেয়েছি; এই "ছাত্রিশবর্ণ্য"টা যে নষ্ট করবে তার বুদ্ধদেবের ন'গুণ পাপ হবে,—(চার নয় ছত্রিশ)—যে রক্ষা করবে তার শঙ্করাচার্য্যের ন'গুণ পুণ্য হবে; দেশটা উচ্ছন্ন যাবে তার জন্য ভাবলে চলবে না, (ইহলোকের খেলা আর ক'দিন?) আমাদের পরকালটা যে ন'গুণ উজ্জ্বল হবে সেটা ভুললে চলবে না।

এই "ছাত্রিশবর্ণ্য"টাকে রক্ষা কি করে' করা যায় "প্রশ্ন ইহাই এখন"। প্রশ্ন বড়ই সঙ্গীন; কেননা ম্লেচ্ছ শিক্ষা ও সংস্কারের সংস্পর্শে এসে অবধি আমাদের সনাতন শিক্ষা-সংস্কার কি রকম আমাদের অজ্ঞাত-সারে যে বদলে যাচ্ছে তা একটু প্রণিধান করে' দেখলেই বুঝা যাবে।

ধন না থেকেও ধনাপবাদগ্রস্ত ; আবার গুণ থাকতেও অনেকের "কোন গুণ নাই, তার কপালে আগুন।"

অন্তর্যামী জানলেই হ'ল, আর কেহ জানল আর না জানল বাদের একই কথা, সে পরকালগস্ত খেয়ালীদের কথা ছেড়ে দিলাম। যাঁরা নটরাজ মানেন না, অধিকারী মহাশয়কেই মানেন, তাঁদের সুবিধার জন্য গোটাকতক সদুপদেশ আমি মৌজের মাথায় বলে' যাচ্চি শ্রবণ কর। কবি বলেচেন—Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. এই তৃতীয় শ্রেণীর greatness কি উপায়ে লাভ করা যায়, আমি তার কতকগুলি মুষ্টিযোগ বলব মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যারা great না হয়েও great হ'তে চায়, এবং যারা চায় না, উভয় শ্রেণীর লোকেরই উপকার হবে।

বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে শতকরা ৯৯ জনের বড় হওয়া-না-হওয়া বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে। কবি বলেছেন—Sweet are the uses of adversity, কিন্তু আমি বলি,—Sweeter are the uses of advertisement. বিজ্ঞাপন আর hypnotism একই মূল সূত্রের উপর অবস্থিত। ঘুমাও-ঘুমাও-ঘুমাও পুনঃপুনঃ বলতে বলতে হাত-চালা দিয়ে যেমন hypnotiser ঘুম পাড়ায়, কানের কাছে কেবল ঘুম, আর ঘুম, আর ঘুম, ঘুমন্ত স্বরে ধ্বনিত হ'তে হ'তে যেমন সত্যই ঘুম আসে—ঘাটে মাঠে পথে আকাশে বাতাসে কেবল তোমার গুণের কথা, তোমার রূপের কথা, তোমার ঐশ্বর্য্যের কথা, তোমার দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা, তোমার শৌর্য্যের কথা, তোমার লেখনীচাতুর্য্যের কথা—তুমি মেটাকে ফুটিয়ে তুলতে চাও,—ক্রমাগত চিত্রিত, বিচিত্রিত,

নাচতে নাচতে গির্জ্জায় যাওয়াটা হয়ত শোভন নয়, কিন্তু শোভন-অশোভন অত বিচার করতে গেলে, গুণের প্রচার কি করে' হয় ?

প্রচারের আর একটা পন্থা আছে—সেটা একটু বাকা ; যখন সোজা আঙ্গুলে ঘি বা'র হয় না, তখন আঙ্গুলটাকে বাকানর বিধি আছে ; এও সেই প্রকার। সোজাসুজি উপায়ে যখন লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল না তখন কবি বলেচেন—**Put thyself into the trick of singularity**—অর্থাৎ যদি বাঁ দিকে টেরী কাটা চলতি ফ্যাসান হয়, ত তুমি কাটবে ডান দিকে ; যদি টিকি রাখা রেয়জ হয়, তুমি টিকি কেটে ফেলবে ; চা খাওয়া প্রথা হ'লে তুমি চা ছেড়ে দেবে, and vice versa ; দেখবে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবেই হবে, লোকে বলবে—লোকটার চিন্তার, চরিত্রের বিশিষ্টতা আছে—**independence of character** আছে। কিন্তু independence কথাটার বড় চড়া গন্ধ, অনেকের নাকে সহ্য হয় না, অতএব এপথে একটু বিপদও আছে ! মোট কথা তবে এই singularity যদি গড্ডলিকা প্রবাহের অনুকূল স্রোত ধরে' চলে তা হ'লে বিপদ খুব কম, যথা—বিলাত প্রত্যাগত হ'য়েও যদি মুরগী না খাও, ডাক্তারী বিদ্যা শিখেও যদি মাদুলির মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, **Astronomy** পড়েও যদি 'মঘার' আঘাতে ভয় কর, নিজে সাহেব সেজেও যদি গৃহিণীকে পর্দ্দার ভেতর পুরে রাখ, তা হ'লে এ **trick of singularity** তোমার মৌলিকত্ব, তোমার বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় প্রদান করবে ; কারণ কুসংস্কার ত্যাগে ও কুসংস্কার পোষণে উভয়ত্রই মৌলিকত্ব থাকতে পারে।

এর চেয়ে বিজ্ঞাপনের আর একটা সহজ ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ

ঐহিক ও পারত্রিক

এই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, সুখদুঃখের আলো-আঁধারে দিশেহারা, আশা-নিরাশার নাগর-দোলায় দোলায়মান মনুষ্য-জীবন শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে যখন অবসন্ন হ'য়ে যায়, আন্তরিক চেষ্টার ফসল যখন ফলে না, আন্তরিক স্নেহ-ভক্তির যখন প্রতিদান মিলে না, সুচিন্তিত কার্য্য-শৃঙ্খলা যখন অর্দ্ধপথে কোন অপরিজ্ঞাত কারণে ছিন্ন হ'য়ে যায়, মানুষ তখন হালে পানি না পেয়ে, এই দুস্তর ভবসিন্ধু পারে এক সুখরাজ্যের কল্পনা করে' ধৈর্য্য ধরে' থাকে—যে সুখরাজ্যে তার সকল অতীত চেষ্টার ফল থরে থরে সাজান আছে, ইহজীবনের সকল ব্যর্থতা যেখানে সার্থক হ'য়ে উঠবে, প্রত্যেক স্নেহবিন্দুর প্রতিদান মিলবে, এ জীবন-মরুভূমির সকল উত্তাপ, সকল নীরসতা অপগত হ'য়ে যেখানে সুধু শান্তি, স্বস্তি, চরিতার্থতা, সৌন্দর্য্য চির-বিরাজমান থাকবে।

স্বর্গের কল্পনাটাই আমার ছেলে-ভুলান "রূপকথা" বলে' মনে হয়, তা সে কল্পনাময় সুখস্থানকে—**Atlantis** বল, **Heaven** বল, **Empyrian** বল, **Valhalla** বল, বেহেস্ত বল, আর বৈকুণ্ঠই বল। বয়স হ'লেও মানুষ শিশুই থাকে ; রোরুদ্যমান ছেলের হাতে পিটে দিলে সে যেমন শান্ত হয়, জীবনের কষাঘাতে দীর্ণ-পৃষ্ঠ মানুষ স্বর্গরূপ মোয়া হাতে পে[redacted] আশ্বাস মাত্র পেয়েই, তেমনিই শান্ত পরিতৃপ্ত হয়।

বাস্তু

বাস্তু প্রধানতঃ তিন প্রকার—বাস্তু-দেবতা, বাস্তু ঘুঘু আর বাস্তু-সাপ।

বাস্তু-দেবতা সম্বন্ধে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এইরূপ কহিয়াছেন, যথা—"পূর্ব্বকালে অন্ধকগণকে বধ করিবার সময় শূলী শম্ভুর ললাটের স্বেদ-বিন্দু ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলে পর, তাহা হইতে এক করালবদন প্রমথের উদ্ভব হয়। সেই ভূতযোনি জন্মিবামাত্র সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। সমর ক্ষেত্রে নিপতিত অন্ধকগণের রুধির স্রোতে পিপাসা নিবৃত্তি না হওয়ায়, সেই প্রমথ প্রমথনাথের ধ্যানে নিমগ্ন হয়; আশুতোষ তাহার নিদারুণ তপশ্চরণে পরিতুষ্ট হইয়া বলেন 'বরং বৃণু'। প্রমথ বলিল 'ভূমণ্ডল হইতে ত্রিদিব পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাস করিতে পারি এই বর প্রদান করুন'; আশুতোষ বলিলেন 'তথাস্তু'। তখন সেই প্রমথ নিজ দেহ বিস্তার করিয়া স্বর্গমর্ত্ত্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেবাসুর সকলেই ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ পিশাচকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া নিশ্চল করিয়া ফেলিলেন। তখন পিশাচ বলিল 'হে দেবগণ, আপনারা ত আমার চলৎ-শক্তি হরণ করিলেন, আমি কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিব?' তখন ব্রহ্মাদি দেবতারা বলিলেন, 'তুমি আজ হইতে বাস্তু-দেবতা হইলে, তোমার প্রীত্যর্থে যে বাস্তু-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইবে তাহারই বলি অর্থাৎ উপকরণ তোমার ভোজ্য হইল।'

বিচক্ষণ দেবতাসকল এই প্রকারে আপনাদের বিপত্তি মানুষের উপর চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।”

পুরাণকার মাত্রেই রূপক ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত; সোজা কথা সাদা রকমের বলা তাঁদের ধারা নয়। কিন্তু এ রূপকের গূঢ় তাৎপর্য্য কাহারও বুঝতে বাকি থাকবে না। আমাদের সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির উপদেবতা-স্বরূপ যে ভূস্বামিকুল নিরীহ রায়তের স্কন্ধে ভর করে' পুরুষানুক্রমে খোস মেজাজে দিনপাত করে' আসচেন, তাঁহাদেরই লক্ষ্য করে' যে এই রূপক রচনা করা হয়েচে, তার আর ভুল কি? আশুতোষরূপী রাজস্ব-বিশারদ পণ্ডিতগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রাজস্বের পাকা বন্দোবস্ত করে', সেই ভূস্বামীদিগকে Rent Collectorএর পদ থেকে উন্নীত করে', বাস্তু-দেবতা বানিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচেন, সেই বাস্তুগণ সমস্ত দেশটাকেই আচ্ছন্ন করে' রেখেচেন। আর 'বাস্তু মধ্যে তু যো বলিঃ' তাঁদেরই প্রাপ্য হ'য়ে রয়েচে। সে বলির অন্ত নেই;—চাষা ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেবে, তার জন্য বাস্তু-দেবতাকে যজ্ঞভাগ দিতে হবে, রৌদ্রে শিশিরে চাষা ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন করবে, তার অগ্রভাগ তাঁকে দিতে হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর বাস্তু-কপোত বা ঘুঘুর কথা বলি শ্রবণ কর। এই বাস্তু-ঘুঘু নানা জাতীয়—পক্ষিতত্ত্ব-বিশারদ লাহা মহাশয় জানেন, যথা—তিলে-ঘুঘু, পাঁড়-ঘুঘু, রাম-ঘুঘু ইত্যাদি, তফাৎ মাত্র রঙে, না হ'লে সবই ঘুঘু। এই কপোতকুল যে ভিটায় চরতে আরম্ভ করে, তার আর নিস্তার নাই। এই কপোতকুলের কবলে পতিত হ'য়ে আজ

না, কিছু করা ত দূরের কথা, কিন্তু তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে এই প্রার্থনা উত্থিত হ'তে আরম্ভ হয়েচে :—

অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালীয়হ্রদং,
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদম্।
যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং,
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি।

৫ই আশ্বিন, ১৩৩০

মাহাত্ম্য নষ্ট হ'য়ে যায় ; golden mean বলে' প্রসন্নকে কেউ মার্জ্জনা করে না, মুখে কা'রও বলতে সাহস হ'ক আর নাই হ'ক। শাদায়-কালায় মিশিয়ে যে চুনোগলি, এণ্টালি প্রভৃতির সৃষ্টি, সে-সকল মাঝা-মাঝি জীবের গুণাগুণ যারা জানে তারা বলে—give me a true-born Englishman or an unadulterated native but not one who is neither fish nor flesh nor a good red-herring. অশ্বতর golden mean হ'লেও প্রকৃতির ত্যাজ্যপুত্র।

জল ও স্থলের মাঝামাঝি যে জিনিষ তার নাম কর্দ্দম ; জলে সাঁতার কাটা চলে, স্থলে দৌড়ান যায় ; কিন্তু হাতিও 'দঁকে পড়লে' কাবু হ'য়ে যায়—এমনকি ব্যাংএও লাথি মেরে যেতে পারে।

সত্যি ও মিথ্যা ছেলেবেলা মনে করতুম চিন্তারাজ্যকে dichotomy করে' ভাগ করেচে। কিন্তু 'ক্রমশো বিজ্ঞতমঃ' হ'য়ে বুঝলুম যে, সত্য ও মিথ্যার মাঝামাঝি একটা খুব প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে, সেখানে সত্যের শুভ্রতা বিনয়ের কলপ দিয়ে মলিন করা হয়েচে, এবং মিথ্যার মালিন্যকে সততার চূণকাম করে' বেশ ধবলতা দেওয়া হয়েচে ; এই সত্য-মিথ্যার মাঝামাঝি ক্ষেত্রে যে খেলোয়াড় জয়যুক্ত হ'তে পারে সে কুরুক্ষেত্র বা ওয়াটারলু-জয়ী অপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝামাঝি যে ত্রিশঙ্কু রাজার পারলৌকিক অবস্থানমার্গ—যে রাজ্যটা হওয়া আর না-হওয়ার মধ্যবর্ত্তী, যে রাজ্যের নাম বাঙ্গালায় বলে 'হইলে-হইতে-পারিত', আর ইংরাজিতে বলে fool's paradise, যে রাজ্যের যাত্রী আমরা অনেকেই, তার খুব বেশী পরিচয় দেবার প্রয়োজন হবে না।

শত্রু ও মিত্রের মাঝামাঝি এক জীব থাকেন তাঁর নাম নিরপেক্ষ

খাটাতেও নারাজ, সুধু মস্তিষ্ক চালনায় যা হয়। দুর্দ্দিনে ইহারাই বেশী কষ্ট পায়, ধনীও নয়, দরিদ্রও নয়।

জানা আর না-জানার মাঝামাঝি, জ্ঞান ও অজ্ঞানতার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাও কি ভয়ানক! কবি বলেছেন—Where ignorance is bliss 'Tis folly to be wise—ইহার অর্থ—এ নয় যে, অজ্ঞানতা ভাল জ্ঞানের অপেক্ষা; ইহার অর্থ—যখন অজ্ঞানতাই সুখের তখন জ্ঞানী হওয়া মূর্খতা। অজ্ঞানতা সুখের কখন? যখন জানা-না-জানার মধ্যস্থলে থেকে মানুষ হাবুডুবু খায়, তখনই বরং অজ্ঞান তিমিরই ভাল। কেননা অন্যত্র কবি বলেছেন—Drink deep or taste not the Pyerian spring; আমাদের চলিত কথায়ও বহুকালের অভিজ্ঞতা এই ভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে—

যে বুঝেচে সে মজেচে
যে বুঝেনি সে আছে ভাল
যে আধ বুঝেচে তারি প্রাণ গেল।

একচ্ছত্রী নিরঙ্কুশ সম্রাট যাঁর ইচ্ছাই আইন,—আর সকল শাসন-ক্ষমতার প্রস্রবণরূপী জনশক্তি, তার আদেশ ও ইচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে শাসনযন্ত্র—এই দুই ধারার,—Autocracy ও Democracyর, মধ্যবর্ত্তী একটা শিকড়া আছে যার নাম Limited monarchy. এ মাঝামাঝি ব্যবস্থার যে বাহার তার খরচ অনেক; সে খরচ বাজে খরচ বলে' দুই একটী দেশ ছাড়া আর সব বড় দেশ থেকে সে শ্বেত-হস্তীর পূজা উঠে গেছে।

স্বাধীন ও পরাধীনের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা হচ্ছে Protectorate; মহাযুদ্ধের পর Protectorate কথাটার কাকু ধরা পড়ে যাওয়াতে,

আর একটা কথা তার পরিবর্ত্তে ব্যবহার আরম্ভ করা হয়েচে—Mandatory ; বস্তু একই, অর্থাৎ দেশটা দেশবাসীরই রইল—কেবল চাবিকাটিটা Mandatory, অর্থাৎ যিনি বা যাঁরা ভারপ্রাপ্ত, তাঁদের আয়ত্ত্বের ভিতর থাকল। এই রকম Protectorate বা Mandatory ইংলণ্ডেরও আছে, ফরাসিরও আছে, ইটালিরও আছে। ফরাসির Mandatory আনাম প্রদেশ, সেখানে রাজা আছেন, তাঁর দরবার আছে—তিনি আইনে সর্ব্বশেষ স্বাক্ষর না করলে আইন মঞ্জুর নয়—কিন্তু মঞ্জুর না করাও তাঁর ইচ্ছা সাপেক্ষ নয় ; এই যে Duality বা দ্বৈতবাদ, কাগজে কলমে ইহার একটা অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু আনামবাসীদের জীবনে ইহার কোনই সার্থকতা নাই ; যদি কিছু থাকে তা অর্থনষ্ট ও মনোকষ্ট দুই একসঙ্গে ; কেননা মোটা মোটা মাহিনার বড় ছোট নেজো ফরাসি কর্ম্মচারী দেশের অর্থ শোষণ কচ্চেন, আর দেশের লোক যে তিমিরে সেই তিমিরে রয়ে গেছে। মাঝামাঝি থাকার পূর্ণ প্রতিফল তারা পাচ্চে। এইরকম সকল Protectorateএরই দুরবস্থা।

আমাদের দেশে Bureaucracy অর্থাৎ Autocracyর কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করে', Democracyর দিকে শাসন-যন্ত্রটাকে নিয়ে যাবার জন্য, মধ্যপথে, Auto-democracy (জানি না এ কথাটা চলতি কি না) বা Diarchy নামধেয় একটা নবীন পদ্ধতির experiment চলেচে। বেওয়ারিশ রোগীর উপরই হাসপাতালে experiment চলে। আমরা বেওয়ারীশও বটে, রোগগ্রস্তও বটে ; তাই আমাদের উপর এই উদ্ভট শাসন-পদ্ধতির experiment চলেচে—দেখা যাক রোগ গিয়ে স্বাস্থ্য ফিরে আসে, কিম্বা রোগ ও রোগী দুইই যায়!

টীকায় বদলে যেতে পারে, কিন্তু কথার অর্থ খুব বেশী বদলান যায় না। এ দুনিয়ায় অনেক সময় কতবার পা পিছলে পড়ে যেতে হয়, কিন্তু কোন কথা না বলে' ঝেড়ে উঠে পড়তে পারলে, পড়ে যাওয়াটার নানা interpretation দেওয়া যেতে পারে ; কিন্তু হুঁচট্ খেয়েছি বল্লে আর 'শয়নে পদ্মনাভ' বলা চলবে না। অতএব Thou shalt not speak out এইটা দুনিয়াদারীর একাদশ Commandment হওয়া উচিত।

সে দিন বাঙ্গালার একজন বিরাটপুরুষ একখানা অগ্নিগর্ভ পত্র লিখে তাঁর উপরওয়ালাকে জানিয়ে দিলেন যে, সব হুকুম বা সকল আবদার, সব মানুষের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। পত্রখানার ভাষা নিয়ে ও ভঙ্গী নিয়ে কতই না আলোচনা গবেষণা হ'য়ে গেছে। যাঁরা পত্র-খানার ধরণটা পছন্দ করেন নি, তাঁরা যদি তাঁদের মনোমত একখানা খসড়া করে' ছাপিয়ে দিতেন তা হ'লে ঠিক বোঝা যেত তাঁদের কিরূপ রুচি ও শক্তি ; তাঁদের টিপ্পনী থেকে ঠিক বোঝা গেল না যে, কি হ'লে তাঁরা সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু ধরণটা যা'ই হ'ক, পত্র লেখকের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে, প্রতিপক্ষ যে বাক্যস্ফূর্ত্তি করতে অপারগ হয়েছেন—তাতেই তাঁর আঘাতের বেগ ও লক্ষ্য যে সম্পূর্ণরূপ সময়, ব্যক্তি ও বিষয়োপযোগী হয়েছে তার আর ভুল নেই। ঘুষিটা চোখে না মেরে, পিঠে মারা উচিত ছিল, অথবা ঘুষি না মেরে চড় মারা উচিত ছিল, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। অথবা কড়া কথা না বলে' দুটা মিছরীর ছুরি হানলে মন্দ হ'ত না, এ তর্কও কোন কাজের নয়। যে হেতু দেখা যায়, যেখানে কাজের প্রতি আস্থা কম, সেইখানেই কায়দার প্রতি দৃষ্টি বেশী ; আর সত্যিকারের প্রাণ যেখানে নেই, সেইখানেই আচারের আড়ম্বরই সর্ব্বস্ব।

কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভাবনার বিশেষ কারণ দেখচি না। প্রথম কারণ, মা-সকল তাঁদের নিজের মামলার ওকালতি নিজেই আরম্ভ করে' দিয়েছেন। এই অসমসাহসিকতার কাজ পুরুষও করতে সাহস করত না। মোকদ্দমা চালাতে হ'লে উকীলের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, সেটা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। ধর্ম্মাধিকরণের কাঠগড়ায় ফরিয়াদী হ'য়ে দাঁড়িয়ে, নিজের মামলার নিজে সওয়াল জবাব করা, প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির অন্যতম পরিচয় বলে' আমার আশঙ্কা হয়। ফল যে খুব সম্ভব মোকদ্দমায় হার, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ হয় না। অতএব স্বামী তথা আ-সামীগণকে আমি আশ্বাস দিয়ে, 'মা ভৈঃ' বলতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হচ্চি না।

মা-সকল যে সব প্রশ্ন নিয়ে রেগেচেন, বা জেগেচেন, যাই বলুন, তার মধ্যে মূল হচ্চে—সাম্য—স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকরণ, equality of the sexes. এই equality বা সাম্য, আপাততঃ এমনই ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত বলে' মনে হচ্চে যে, সে সম্বন্ধে যে কোন তর্ক চলতে পারে তা মনেই আসে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য মাত্র এক হিসাবে আছে—স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই genus homo এই পর্য্যায়ভুক্ত; তা ছাড়া, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সমতা নেই বল্লেই হয়—সামাজিক বা পারিবারিক unit হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষ দুটি ভিন্ন জীব।

ভিন্ন হ'লেই ছোট বড় হ'তে হবে, তার কিছু মানে নেই; বোম্বাই আম আর মর্ত্তমান কলা, দুটা ভিন্ন ফল,—কিন্তু কে ছোট কে বড়, ও-প্রশ্নের কোন মানেই হয় না; দশ টাকায় এক মণ চাল,—দশটা টাকা, আর এক মণ চাল, দুই তুল্য মূল্য হ'তে পারে, কিন্তু দুটা

এক বস্তু নয়। অতএব দেখা যায়, ভিন্ন হ'লেও তুল্য-মূল্য হ'তে পারে; কিন্তু তুল্য-মূল্য বলে' এক বা সমধর্ম্মী নাও হ'তে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে সেই কথা—ভিন্নধর্ম্মী বলে' কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় নয়; তুল্য-মূল্যই যদি হয় তা হ'লেও এক নয়।

People do not realise that equity and equality are not the same thing, that equality may co-exist with difference, and is not secured by sameness, and that just as the heart and the liver may each be considered "equals", tho' performing different functions, so the equality between men and women may, after all, best be secured by not striving for identity.

স্ত্রী ও পুরুষ তথাপি সমান, যদি মা-সকল একথা বলেন, তা হ'লে আমাকে বলতেই হবে, মা-সকল "রেগেছেন", জেগেছেন একথা বলতে পারব না।

তারপর স্বাধীনতার কথা; মা-সকলের আব্দার এই,—কেন স্ত্রী পুরুষের অধীন হ'য়ে, আজ্ঞাবাহী, পুতুল-নাচের পুতুল হ'য়ে থাকবে! এখানেও আমি "বাগীর"ই লক্ষণ দেখতে পাই—"জাগার" লক্ষণ দেখতে পাই না।। প্রথম কথা, গৃহস্থলীটা প্রাচীন Sparta রাজ্যের মত যুগ্ম রাজার রাজ্য হবে, না এক রাজার রাজ্য হবে? দুইএ এক না হ'য়ে গিয়ে দুইজন (স্ত্রী ও পুরুষ) "স্বতন্ত্র উন্নত" হ'য়ে গৃহস্থলীকে যদি Democratic নীতি অনুসারে শাসন করতে চান, তা হ'লে রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়েই বেশী সুখশান্তি লাভের আশা

প্রসন্ন। হাতে-পায়ে বেড়ির মধ্যে ত তুমি। বুড়ো ব্রাহ্মণ কোন যোগ্যতা নেই—নিজের ভালমন্দ জ্ঞান নেই—যেন কচি ছেলে—যেন পাগল—তুমিই ত আমার বুড়ো বয়সের সব চেয়ে বড় বাঁধন—তা ছাড়া আমার মঙ্গলা আর-একটা বাঁধন, বাঁধনের মধ্যে ত এই দুই।

আমি। গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ—প্রসন্ন ঠিক শাস্ত্রসম্মত হিন্দু জীবনই ত যাপন কচ্ছ। প্রসন্ন, তোমার আর পুনর্জন্ম হবে না, তুমি তরে' গেলে—তুমি স্বাধীন হও আর না-হও, তা'তে কিছু এসে যাবে না। কিন্তু বয়সকালে তুমি ত ছাড়া-গরুটির মত ছিলে না—তখন ত গোজেবাঁধা-গরুর মত সাধু ঘোষের গোয়ালে বাঁধা থাকতে।

প্রসন্ন। যখন যেমন তখন তেমন করতে হবে ত! না হ'লে, সংসার চলবে কেন?

আমি বড় বিস্মিত হলুম; প্রসন্নর দিক দিয়ে স্বাধীনতার আবদার একবারও এল না; আমি "যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই" হিসাবে জাগিয়ে তুলতে গিয়েও কৃতকার্য্য হলুম না। হায় রে বাঙ্গালীর নারী!

প্রসন্ন। রাখ তোমার স্বাধীনতার বাজেকথা; দুটো মহাভারতের কথা বল—আমার এবেলা কোন কাজ নেই।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কোন কাজ না থাকলে সে আমার মুখে শুনতে আসত; পুণ্যবতী বলেই শুনত, কি শুনে পুণ্যবতী হ'ত, তা ঠিক বলতে পারলুম না। যা হ'ক, স্বাধীনতার কথা ভাবতে ভাবতে সৈরিন্ধ্রীর ইতিহাস মনে পড়ে' গেছল—সেইখান থেকে গল্পটা আরম্ভ করে' দিলুম।

ভগিনী সুদেষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল—"শুভে! সুজাতমদিরাতুল্য-মোহকারিণী এই শোভনা কামিনী কে?" সুদেষ্ণা ভ্রাতাকে তাঁহার পরিচয় দিলেন, এবং উভয়ের মিলন সাধন জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া উপদেশ দিলেন, কৌশলে সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের নিকেতনে প্রেরণাভিলাষে বলিলেন—"সৈরিন্ধ্রি, আমি পিপাসায় সাতিশয় ব্যথিতা হইয়াছি, অতএব তুমি শীঘ্র কীচকের গৃহে গমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুরা আনয়ন কর।" সৈরিন্ধ্রী এই আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য বিরাট-মহিষীকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না; তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে শঙ্কাপূর্ণ চিত্তে দৈবের শরণাপন্ন হইয়া কীচকের গৃহে প্রবেশ করিলেন। পারগমনেচ্ছু ব্যক্তি নৌকালাভ করিলে যেমন আহ্লাদিত হয়, কীচক সেইরূপ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল।

এ কি চিত্র? ভ্রাতা, ভগিনী, আশ্রিতা কুলললনা, এ তিনের মধ্যে এ কি বীভৎস ব্যাপার? এ কি 'যা শত্রু পরে পরে'? স্বীয় প্রেমাস্পদের হৃদয়ে একাধিপত্য রক্ষা করবার মানসে, ভগিনী জেনে-শুনে আশ্রিতাকে পশুপ্রকৃতি ভ্রাতার কবলে প্রেরণ কল্লেন? এই কি অমৃত সমান কথার নমুনা, অথবা কথা সত্য এবং সত্যই একমাত্র অমৃত, সুমিষ্ট না হ'লেও?

কীচকের হস্তে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী রাজার শরণার্থিনী হইয়া রাজ-সভায় উপস্থিত; যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে কীচক তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। দ্রৌপদী আত্মগোপনকারী নিরুদ্বিগ্ন স্বামিগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"পতিব্রতা প্রেয়সীকে সূতপুত্র

কর্ত্তৃক বধ্যমানা দেখিয়াও যাঁহারা ক্লীবের ন্যায় সহ্য করিতেছেন—তাঁহাদের বীর্য্য ও তেজ কোথায় রহিল ?” বিরাট-রাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—“কীচককে দণ্ডিত না করায় আপনার রাজ-ধর্ম্ম দস্যু-ধর্ম্মের তুল্য হইতেছে।”

বিরাট কহিলেন, “তোমরা উভয়ে পরোক্ষে কিরূপে বিবাদ করিয়াছ তাহা আমি জানি না, তদ্বিষয়ের যাথার্থ্য অবগত না হইলে আমি কি প্রকারে বিচার-কৌশল প্রয়োগ করিতে পারি।” বিচার-কৌশলের বিশেষত্বই এই। ফলে কোন প্রতীকার হইল না ; যুধিষ্ঠির ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইলেও পত্নীকে বলিলেন—“যাঁহারা বীরপত্নী হ’ন. পতির অনুরোধে তাঁহারা দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করেন। সামান্যা নটীর ন্যায় নির্লজ্জা হইয়া রাজসভায় ক্রন্দন করা উচিত নহে ; সভাসদগণের ক্রীড়ায় ব্যাঘাত হইতেছে, তুমি এখন যাও, গন্ধর্ব্বেরা সময় পাইলে বৈরনির্য্যাতন করিবেন।” এই প্রকার ইঙ্গিত করিয়া যুধিষ্ঠির নির্য্যাতিতা পত্নীকে স্থানান্তরে যাইতে বলিলেন। যাইবার সময় সৈরিন্ধ্রী কহিলেন,—“আমি যাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণী বোধ হয় তাঁহারা অতিরিক্ত দয়াশীল !” রোষাবেগ বশতঃ আরক্ত-নয়না আলুলায়িতকেশা কৃষ্ণা যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া রাজসভা ত্যাগ করিলেন।

“ভীমসেন ব্যতীত আমার মনঃপ্রীতি সম্পাদন করিতে আর কেহই সমর্থ হইবে না”—এই চিন্তা করিতে করিতে সৈরিন্ধ্রী, মৃগরাজবধূ যেমন দুর্গম বনে প্রসুপ্ত সিংহকে জাগরিত করে, তদ্রূপ ভীমসেনকে প্রবুদ্ধ করিলেন ; বলিলেন,—“উঠুন, মৃতের ন্যায় কি প্রকারে নিদ্রিত রহিয়াছেন—আপনার ভার্য্যা অপমানিতা, পাপিষ্ঠ জীবিত, আপনি কেমন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন ?”

কামিনী-কাঞ্চন

বুদ্ধদেব থেকে আরম্ভ করে' মহম্মদ, তারপর পরমহংসদেব পর্য্যন্ত কামিনীর প্রতি একান্ত বিমুখ। ভাষাটা যদি ভাবের আবরণ না হ'য়ে ভাবের অভিব্যক্তিই হয়, তা হ'লে কামিনী কথাটাতেই নারীর প্রতি চিরদিনের অশ্রদ্ধাই crystallised হ'য়ে রয়েছে। Wo-man কথাতেই নাকি manএর woeই সূচনা করে। মাঝে মাঝে কবি, (যাঁকে কবিগুরু বাতুল বলেচেন) নারীকে ministering angel বলে' সুখ্যাতি করেচেন; কিন্তু সে কথায় নারীর কামিনী আখ্যা মুছে যায় নি, সংসারেও তার স্থান খুব প্রশস্ত হ'য়েও যায় নি। কিন্তু স্বর্গই বল আর সংসারই বল, নারী ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না, অতএব যতই হেনস্তা কর, নারীকে একটা প্রকৃষ্ট স্থান দিয়ে রাখতেই হবে; সে স্থান কোথায় হবে তা' নিয়ে জগৎ জুড়ে একটা বিতণ্ডা চলেচে; শীঘ্রই পুরাতন ব্যবস্থার একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে যাবে বলে' মনে হয়। নারী মানুষ, সে আপনার একটা হেস্তনেস্ত করে' জগতের দরবারে আপনার স্থান করে' নেবে। কিন্তু কাঞ্চন সম্বন্ধে অন্য কথা।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্। এই ত কাঞ্চনের প্রতি সনাতন গালাগাল। আমার মনে হয় একথা যিনি বলেছিলেন তিনি আমারই মত অর্থহীন নিরর্থক জীবন যাপন করে', "দ্রাক্ষাফল হয় অতিশয়

বাসাংসি জীর্ণানি

পাগলা মাথম বলেছিল—"কাপড়ের ভিতর তুইও নেংট, আমিও নেংট, সবাই নেংট" ; তা'তে মেচোহাটার মেচুনী-বেটি তার গায়ে আঁস-জল ছিটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কথাটা সত্যি ; নিছক মানুষটা উলঙ্গই বটে, তার কোমরের কাপড়খানা বা পাজামাটা মানুষ নয়, মানুষটাকে ঢেকে রাখবারই যন্ত্রবিশেষ।

শাস্ত্র বলেচেন—মৃত্যু মানে কাপড় ছাড়া, পুরাতন ছেড়ে নতুন কাপড় পরিধান করা ; এ কথার ভিতর একটু রহস্য র'য়ে গেছে। যেটা মানুষ, যেটা সত্যিকারের তুমি বা আমি, যেটা উলঙ্গ নিরুপাধিক আত্মা, সেটা ঠিক উলঙ্গই থেকে যায় ; কণ্ঠী নামাবলি, আচকান টুপী, হ্যাট কোট, পাগড়ী পায়জামা পরা মনুষ্যদেহের ভিতর দিয়ে সেটা উলঙ্গই থেকে চলে' যায়, সেটার বিকৃতিও হয় না, পরিবর্ত্তনও হয় না।

কাপড়ের ভিতর তুমি আমি উলঙ্গ থাকলেও, পরিচ্ছদের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হ'য়ে যায় ; তোমার আমার প্রকৃতির, সংস্কারের, **mentality**র ছাপ পরিধেয়ের উপর ফুটে ওঠে। আমি শুনেচি যীশুখৃষ্টকে ক্রস্ থেকে নামিয়ে যে পরিচ্ছেদে ঢাকা দিয়েছিল, সেটা এখনও **Vatican**এ যত্ন করে' একটা আধারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েচে . বৎসরে একবার সে আধারটা খোলা হয়। কয়েক বৎসর

কাটা কাপড়ের পরিচ্ছদ ছাড়া আর একটা অদৃশ্য পরিচ্ছদ আছে, যেটা মানুষের মনটাকে আরও গভীরতর ভাবে ঢেকে রাখে—যার প্রভাব তার পোষাকে ত ব্যক্ত হয়ই—তার চোখে মুখে, কথায় বার্ত্তায়, হাসিতে কাশিতে, কাজে অকাজে পর্য্যন্ত ফুটে ওঠে—সে পরিচ্ছদ বা প্রচ্ছদের নাম গতানুগতিকতা, **tradition, custom** ইত্যাদি।

সব গতানুগতিকতার প্রারম্ভে একটা বিশিষ্ট হেতুবাদ ছিল, একটা **raison d'etre** ছিল, এটা কল্পনা করা অন্যায় হবে না। হয়ত সে হেতুবাদ পণ্ডিত গোষ্ঠীর মনের ভিতর লুক্কায়িত থাকলেও খুব স্পষ্টই ছিল। কিন্তু লুকোচুরীর মধ্যে, কালক্রমে সে হেতুবাদ ঝাপসা হ'য়ে এল, ক্রমে পণ্ডিতদের মন থেকেও সেটা উপে গেল। তখন "বিয়েয় বেরাল বাঁধার" মত সেটা একটা অপরিজ্ঞাত হেঁয়ালী-মাত্রে পর্য্যবসিত হ'ল; "এটা কর কেন" জিজ্ঞাসা কল্লে সকলেই বলতে আরম্ভ কল্লে—"ওটা করতে হয়"। "যদি না করি তা হ'লে কি হয়?" তার উত্তরে কোন গূঢ় অকল্যাণের ভয় প্রদর্শন করা হ'ল। ব্যাপার এইখানে এসে দাঁড়াল—"হয়" আর "ভয়ে"র রাজ্য চলতে লাগল। ভূতচতুর্দ্দশীতে চৌদ্দ প্রদীপ কেন দিতে হয়, আর চৌদ্দ শাক কেন খেতে হয়, তার উত্তর—"হয়, নইলে ভূতে ধরে", নয়ত একটা আজগুবি **electricity** ঘটিত ব্যাখ্যা, নয়ত গালাগাল।

এই 'হয়' আর 'ভয়ে'র জ্বালায় দেশটা ঝালাপালা হয়েচে; অতএব জানবে আর দেরী নেই, 'কাপড় ছাড়বার' সময় হ'য়ে এসেচে, বহুদিনের জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে' নববস্ত্র পরিধানের সময় এসেছে, খোলস্ ছেড়ে নবজীবন আরম্ভ হ'তে চলেচে, দুর্ব্বল দুর্ব্বাক্যের আঘাতে তাকে আর আটক করতে পারবে না।

ভারতের যুগে যুগে এই রকমই হয়েচে। অজ্ঞানতার মহাপ্লাবন থেকে বেদের অর্থাৎ জ্ঞানের উদ্ধার—সে জ্ঞানের দিব্যজ্যোতি যখন আবার যজ্ঞের ধূমে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে নিষ্প্রভ হয়েচে, তখন বুদ্ধ প্রবুদ্ধ হয়েচেন। আবার চারিদিকে অজ্ঞানতা, নিরর্থক গতানুগতিকতার প্রভাব বিস্তৃত হ'য়ে জাতটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে উঠেচে, অর্থহীন 'হয়'কে 'নয়' করতে প্রস্তুত হয়েচে, ভয়কে শিরোধার্য্য করে' নিতে রাজী হচ্চে না; প্রতি কথায় 'কেন' জিজ্ঞাসা করতে সুরু করেচে, সদুত্তর না পেলে 'হয়' আর 'ভয়'কে যুগপৎ জলাঞ্জলি দিয়ে নব পরিচ্ছদে—যুক্তির জ্ঞানের নির্ভীকতার স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচ্ছদে, বিভূষিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠবে।

একদিকে গুরু দেবতা আর-একদিকে কুম্ভীপাক নরক, এই দুইএর জোরে এতাবৎকাল সমাজনেতৃগণ সমাজটাকে মুঠোর ভেতর করে' রেখেছিলেন; এখন হাতের চেয়ে আম বড় হ'য়ে উঠেছে, আর কুম্ভীপাকটাকে মোটেই লোকে মানতে চাচ্চে না। এখন যাকে মানতে চাচ্চে, অর্থাৎ যুক্তিকে ও জ্ঞানকে, সেটা গুরুদেবতাগণের মোটের উপর খুবই অভাব হ'য়ে পড়েচে। তাঁদের এখন সম্বলের মধ্যে গালাগাল, যে কেহ তাঁদের বিরোধী—যাহা কিছু তাঁদের বিরোধী—তার প্রতি অজস্র গালিবর্ষণই তাঁদের বল। তাঁরা বুঝতে পারচেন না যে, 'হয়' আর 'ভয়ে'র দ্বারা আর রাজত্ব করা চলচে না; দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ইংরাজ রাজের তা চলচে না, তাঁকেও কাউন্সিলের মধ্যে ও কাউন্সিলের বাইরে কৈফিয়ত দিতে হচ্চে, লোকের মত জানতে হচ্চে, বুঝতে হচ্চে, বোঝাতে হচ্চে।

ঠিক এই পর্য্যন্ত এসে পৌঁছিচি, এমন সময় প্রসন্ন এসে পাশে

ভিতর সকল সময় না পড়লেও, সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ "বরিষার বারিধারা প্রায়", সততই ঝরতে থাকে ; কবির কথায়, "উঠতে খোঁটা বসতে খোঁটা শুনবি সাঁজ সকাল"—তা হ'তে অব্যাহতি নেই।

কেহ কেহ বলতে পারেন যে শাশুড়ী মাত্রেই কি বধূ নির্য্যাতন করেন ? আমি বলি করবার ত কথা, তবে যদি কোন স্থানে তার অভাব হয়, তার বিশেষ কারণ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বিচক্ষণতা, তাঁর বিবেক বুদ্ধি বা সহৃদয়তা নয় ; বাক্যের প্রস্রবণ যদি না ছোটে, সেটা বাহিরের কোন উপলখণ্ড স্রোতের মুখ বন্ধ করার জন্য, জলের বেগের অভাব হেতু নয়। আমি সাধারণ নিয়ম বল্লুম, তার ব্যতিক্রম যদি কোথাও হয়, তার কারণ বিশেষভাবে অনুসন্ধান করলে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর প্রকৃতির বাহিরে কোথাও পাওয়া যাবে, তাঁর ভিতর পাওয়া যাবে না।

মা'র মত স্নেহময়ী শাশুড়ী কি হয় না ? আমি বলব সেটা নারীর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। নারী কারো "মত" হ'তে পারে না, হয় মা হবে, না-হয় মা হবে না,—সৎমা হবে, মা'র "মত" হ'তে পারবে না। হয় স্নেহময়ী মাতা, নয়ত বিষধরী বিমাতা ; হয় নারী তোমাকে ভালো-বাসবে, না-হয়, তোমাকে "দুটি-চক্ষের বিষ" দেখবে ; মাঝামাঝি কিছু হওয়া তার প্রকৃতি নয় ; সুতরাং শাশুড়ী যখন নববধূর মা ন'ন, তার মা'র "মত" হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তিনি তার বিমাতাই হবেন ; আর সৎমা আর শাশুড়ী একই পদার্থ, একটু উল্টাপাল্টা।

মাতা পুত্রবৎসলা, পিতা কন্যাবৎসল, ইহাই biological সত্য। পুত্রবৎসলা মাতা দেখেন, যৌনধর্ম্মের নির্ম্মম নিয়মে স্নেহাস্পদ পুত্র অপর নারীর স্নেহের পাত্র, অপর নারীকে স্নেহের ভাগ দিচ্ছে, নারী হ'য়ে মাতা তা সহ্য করতে পারেন না। স্বামী পত্ন্যন্তর গ্রহণ করলে তাঁর

"মা"র এই ব্যবহার বা অনুরূপ ব্যবহার "মেয়ে" অর্থাৎ বধূ কি ভুলতে পারে? কেন ভুলবে? সুতরাং শ্বাশুড়ী যখন dowagerত্ব প্রাপ্ত হ'ন, এবং বধূ সামাজ্ঞী হ'য়ে বসেন তখন, "গাড়ি পর্ লা" হ'য়ে যায়। তখন যদি বধূ সুদ সমেত শ্বাশুড়ীর প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে থাকেন ত আর্ত্তনাদ করলে চলবে কেন? One who sows the wind must reap the whirlwind—এ ত পড়েই রয়েচে। এই রকম চল্ল পরের পর—নারী যতদিন নারী থাকবে, দাসী হ'য়ে ঢুকবে আর ফাল হ'য়ে, অর্থাৎ শ্বাশুড়ী হ'য়ে, বেরুবে—ad nauseam.

সংসারের ভিতর বধূ পুত্রের স্নেহে ভাগ বসায় বলে' শ্বাশুড়ী জ্বলে মরেন। কর্ত্তার স্নেহে যদি কেহ ভাগ বসায় তা হ'লেও তাই হয়। কিন্তু কর্ত্তার স্নেহে যে ভাগ বসাতে পারে, সে কে? সেও নারী, কুলস্ত্রীই হ'ক আর কুলটাই হ'ক। তা'তেও তিনি জ্বলে মরেন. সংসারে অশান্তি বিশৃঙ্খলা আসে,—কিন্তু বধূটীর মত, সে জ্বালা মেটাবার পাত্র হাতের কাছে থাকে না, সুতরাং জ্বালা দ্বিগুণ হ'য়ে ওঠে। একজন রমণীই বলেচেন—I must accept here as in all relations between the sexes, the validity of the man's plea that rings—yea, and will continue to ring—through the centuries: "The woman tempted me."

অতএব যে দিক দিয়েই হ'ক, বধূর শত্রু শ্বাশুড়ী, শ্বাশুড়ীর শত্রু বধূ বা অপর নারী। পারী সহরের প্রসিদ্ধ একজন Police Commissioner কোন দুষ্কর্ম্মের Report তাঁর হুকুমের তলে আসলে, নীল পেন্সিলে প্রথম হুকুম দিতেন—Cherchez la femme. এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই না হোক অধিকাংশ স্থানেই, অনুসন্ধানের ফলে বা'র

হ'ত যে, কোন নারী-ঘটিত গোলমাল নিয়েই দুষ্কর্ম্মটী সংঘটিত হয়েছে। এ স্থলেও তাই। সংসারের মধ্যে নারীর দুঃখের নিদান খুঁজে বা'র করতে হ'লে—Cherchez la femme, দেখবে নারীই নারীর পরম শত্রু, পরম দুঃখের কারণ, নিশিদিন নির্য্যাতনের যন্ত্র-স্বরূপ বিদ্যমান।

বাঙ্গালাদেশে নারীর অবস্থা আলোচনা করবার সময় অনেকে রঘুনন্দনকে দোষ দিয়েছেন, শিক্ষার অভাবের কথা বলেছেন। ও-সব একেবারেই অসঙ্গত কথা। যে-দেশে রঘুনন্দন নেই এবং শিক্ষা আছে, সেখানেও নারীর সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ মোটের উপর একই। Cattiness স্ত্রী-সুলভ গুণ বা দোষ। All women are cats—এটা ইংরাজী কথা! একজন বিদুষী ফরাসী রমণী আমাকে বলেছিলেন—Monsieur, nous sommes des chiennes. ইংলণ্ড বা ফ্রান্সে শিক্ষার অভাব নেই, আর সে দেশে রঘুনন্দনও নেই। কেউ হয়ত বলবেন, সেখানে তেমনতর শিক্ষা হয় নি, যে-শিক্ষায় নারীর প্রকৃতি বদলে যায়। সে-শিক্ষা China থেকে Peru পর্য্যন্ত আজও কোথাও হয় নি বটে; সুতরাং হবারও যে বড় ভরসা আছে তা নেই। আর "দেবী"দের এত শিক্ষার অপেক্ষাই বা কেন?

তবে পুরুষ যে কবুল দিয়ে বসেছে সেটার কারণ কি? আমি একজন ইংরাজ মহিলারই কথায় তার উত্তর দিয়ে এই নারী-মঙ্গল শেষ করব—

Men's chivalry as well as their pride has woven a cloak of silence around this question; this silence has protected women—even the worst.

হয় না, বা হয় নি বলে' উভয় পক্ষের কা'রও সন্দেহ হয়, সেইখানেই গোল বাধে। কিন্তু যতদিন উভয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সুধু উভয়ের জন্যই জীবনধারণ করে' থাকে, ততদিন তাদের মিলনটা 'আবাগে' আর 'আবাগী'র মিলন ছাড়া আর কিছুই হয় না ; জন্তু-জানোয়ারের মিলন তার চেয়ে কিছুতেই অন্যবিধ নয়।

বিয়েটাকে যে হিন্দুশাস্ত্রে জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন বলেচে তার নিগূঢ় অর্থ থেকে, সুধু বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে গোড়ামির একটা খুব কায়মি যুক্তি ছাড়া, আর কিছু পাওয়া যায় না তা' নয়। আমি বুঝি—আমার পূর্ব্বজন্ম আমার পিতৃপুরুষগণ, আর আমার পরজন্ম আমার ঔরসজাত সন্তান থেকে আরম্ভ করে' আমার ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ। এ-ছাড়া পূর্ব্বজন্ম আর পরজন্মের আমি কোন মানেই খুঁজে পাই না। আমার পূর্ব্বজন্মের অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষগণের চেহারা ও চরিত্র নিয়ে আমি জন্মেচি, তাঁদের শক্তি এবং দুর্ব্বলতার সমষ্টি potentialরূপে, সম্ভাবনা-রূপে আমার ভিতর রয়েছে ; সে সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে, এবং আমি যে নব নব পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে চলেছি, তার সাহায্যে বা তার ধাক্কায়, আমার চেহারা আর চরিত্রের যথাযথ পরিবর্ত্তন হ'য়ে, আমারই পূর্ব্বজন্মের চেহারা আর চরিত্রের বনিয়াদের উপর, দৃশ্যতঃ এবং বস্তুতঃ একটা নূতন জীব তৈরী হ'য়ে, এই জীবন-নাট্যমঞ্চে অভিনয় করে' চলে' যাব। আমি যদি সন্তানোৎপত্তি না করে' জীবনটা শেষ করে' যাই, তা হ'লে আমার আর পরজন্ম বলে' কিছু হ'ল না, আর সেইখানেই আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের অথবা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ও সাধনার শেষ হ'য়ে গেল। প্রকৃতি স্বয়ং অনেক সময় undesirable বংশের বিলোপ-সাধন করেন ; অপদার্থ লম্বোদর ঘি-দুধের যমগুলার যে বংশলোপ হয়,

মিশে ভীমনাগের মণ্ডা হয় ; আর চিনি চড়িয়ে রস পেকে এলে, তা'তে ছানা ছেড়ে দিয়ে তাকে সেই তাড়ু দিয়ে নাড়লেও ভীমনাগের মণ্ডা হয়। উভয়ত্র তাড়ু-নাড়াটাই common factor আর সেটা খুব essential factor. এই জীবনে স্ত্রীপুরুষের মিলনের মধ্যেও—এই জীবন-মরণের অগ্নিকুণ্ডের উপর অবস্থিত সংসার কটাহে, সুখ-দুঃখের আলোড়ন-বিলোড়নের মধ্যে, দুটী হৃদয় যে গলে' গিয়ে, মিশে গিয়ে, এক হ'য়ে যায় তার নাম—প্রেম। যুবক-যুবতীর হৃদয় যে টগ্‌বগ্ করে' ফুটতে ফুটতে, একটা আর-একটার দিকে ছুটে গিয়ে শান্ত হ'তে চায়, সেটার নাম দেহের, স্নায়ুর উত্তেজনা, তার নাম কাম,—সেটা "বরষিল মেঘ" ত "ধরণী ভেল শীতল", সেটার কথা না বলাই ভাল। নোটের মাথায় সেটা স্বার্থপরতা, Egotismএর চূড়ান্ত Egotism ; এই Egotism, এই টগ্‌বগে প্রেমকে বাদ দেওয়াও যায় না, তবে তাকেই বিবাহের চূড়ান্ত সার্থকতা করেচ কি অমনি সহস্র জীবনের গতিটা, Idealটা পালটে গেছে ; তা হ'লেই নিক্তির ওজনে দাম্পত্যের দাবী-দাওয়ার বিভাগ করবার আবদার আসবে, কে বড় কে ছোট, "বর বড় কি কনে বড়" তার মাপকাটী খুঁজতে ছুটে বেরিয়ে পড়তে হবে, স্বামীর কাছে আত্মোৎসর্গের নাম হবে দাসীত্ব, ছেলে-মানুষ করার নাম হবে নারীত্বের অপচয়, আর যার জোরে এত লম্ফঝম্ফ অর্থাৎ "যৌবন জলতরঙ্গ"—ততক্ষণে তা'তে ভাটা পড়ে আসবে।

আমাদের দেশে আমাদের সমাজে এই টগ্‌বগানিকে প্রশ্রয় দেবার ব্যবস্থা নেই,—হয় ভালই, না-হয় কুছপরোয়া নেই। কারণ এই সংসার-কটাহে সুখদুঃখের তাড়নার মধ্যে দুইএ মিশে এক হবেই হবে, তবে একেবারে ভীমনাগের মণ্ডা যদি না-হয় ত কুছপরোয়া নেই। কারণ

মহাত্মার ভুল

একজন ইংরাজ লেখিকা বলেচেন— 'Truth-telling does not pay in the long run. তবে আমি লাভের খাতিরে সত্যকথা বলচি না এই যা, নইলে বাস্তবিকই সত্যকথা বলে' লাভ নেই এ কথা সত্য ! এই রকমই দুনিয়া, কি করা যাবে !

ঘটনা সত্য, আমার মৌতাতের মুখের কথা নয়, আজগুবী কল্পনা নয়, সত্য ঘটনা।

আমার দাওয়ায় বসে' আছি, একখানা কয়লা-বোঝাই গরুর গাড়ি আমার কুঁড়ের সুমুখের রাস্তা দিয়ে মন্থর গমনে চলে' যাচ্ছে— একজন গরুর ল্যাজ মলচে, আর-একজন কয়লার বস্তার উপর বসে' চীৎকার করে' বলচে—"লে—কোইলা" ; দুইজনেই বেহারী হিন্দুস্থানী। আমার কুঁড়ের সম্মুখের বাড়ী থেকে কে জিজ্ঞাসা করলে—"কত করে' কয়লা ?" গাড়ির উপরকার লোকটা বল্লে—"ন' আনা মণ।"

প্রশ্ন। কয়লা ওজন করে' দিবি ?

উত্তর। তা হ'লে বার আনা—

প্রশ্ন। তবে ন' আনা মণ বল্‌চিস্ ?

উত্তর। তা' জানে না, লিবে ত লাও, হামি অত জানে না।

প্রশ্নকারী। আচ্ছা, বার আনাই দেব, ওজন করে' দিয়ে যা।

আর পরকালেই যদি সব হিসাবের নিকাশ হ'ত, তা হ'লেও কোন গোল হ'ত না ; তা হ'লে

সঙ্কীর্ণ এ ভবকুলে দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে
করিতাম অবহেলা পরলোকে !

কেননা, কেই বা পরলোকের খোঁজ রাখচে ! কিন্তু ব্যাপার তা নয়. এইখানেই সব কাজের বোঝাপড়া হ'য়ে থাকে : ব্যক্তির বল, জাতির বল. বোঝাপড়া এই এক পুরুষে, না হয় দু' পুরুষে, না হয় তিন পুরুষে, —নয়ত পুরুষ-পরম্পরায় যুগ-যুগান্তর ধরে' তার প্রায়শ্চিত্ত চলতে থাকে। '৫৭ সালের বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত ত জগৎ শেঠ থেকে আরম্ভ করে' চুনোপুটী সকলেই করে' গেছে, আর বাংলার লোক—জনসাধারণ, ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে বসেছিল বলে', আজও সেই Criminal indifferenceএর প্রায়শ্চিত্ত করচে—যে বিষের পাত্র অপরিণামদর্শী যুবার মুখে ধরেছিল, সেই বিষপাত্র আজও জনে-জনে পান করচে।

কিন্তু কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েচি ! কয়লাওয়ালার কথা থেকে একেবারে পলাশীতে গিয়ে পড়েচি।

গান্ধীজীর ভুল হয়েচে বল্লে হয়ত দেশসুদ্ধ লোক আমার উপর খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠবে, আমার তা'তে বিশেষ এসে যাবে না। আমি বলতে বাধ্য—গান্ধীজীর ভুলই হয়েচে, এবং খুব বড় রকমেরই ভুল হয়েচে। তিনি মানুষ চিনতে পারেন নি ; "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"—তাঁর হীরার ধার এই মেষপালের শিংএর স্পর্শে ভেঙ্গে গেছে। তিনি নিশ্চয়ই এখন তা বুঝতে পাচ্চেন ; তাঁর শিষ্যবর্গ সে কথা স্বীকার করায় গুরুর অমর্য্যাদা করা হবে ভাবলেও, আমি বলব তাঁর মত বিচক্ষণ পুরুষ নিশ্চয়ই নিজের ভুলটা বুঝতে পাচ্চেন ; তিনি

প্রসন্ন গোয়ালিনীর আধ্যাত্মিকতা

প্রসন্ন দুধে জল দেয়, আর খাঁটি দুধ বলে' বিক্রী করে ; জিজ্ঞাসা করলে গাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেয় ; আবার বার মাসে তের পার্ব্বণ করে, ষষ্ঠী থেকে ওলাবিবি পর্য্যন্ত কেউ বাদ যায় না ; বারব্রত করে, তার উপর দরিদ্র ব্রাহ্মণের সেবাও করে, মুষ্টিভিক্ষাও দেয়। এখন প্রসন্নকে materialism-গ্রস্ত বলব, না spiritual বলব, এই হচ্চে প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারলে, একটা বড় রকম প্রশ্নের মীমাংসা হ'য়ে যাবে, সেটা হচ্চে এই—ইউরোপ বলতেই material, আর এসিয়া তথা ভারতবর্ষ বলতেই spiritual একথাটা সত্য কি না, বা কতখানি সত্য তার মীমাংসা হ'য়ে যাবে।

কেউ কেউ বলতে পারেন, প্রসন্ন কি একটা type, প্রসন্ন কি Asiatic তথা ভারতবর্ষীয় চরিত্রের epitome, যে প্রসন্ন-চরিত্র আলোচনা করে' কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে, সমগ্র Asia বা ভারতবর্ষে খাটবে ? প্রথমে ত সন্দেহ উঠতেই পারে যে প্রসন্ন মেয়ে-মানুষ, অতএব তার চরিত্র আধখানা Asia বা আধখানা ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলতে পারে, আর-আধখানার সঙ্গে মিলবে না, একথা ত ধরেই নেওয়া চলে।

তোমরা প্রসন্নকে চেননা, তাই এই অর্ব্বাচীনের আপত্তি তুলচ।

আমি প্রসন্নকে জানি, চিনি—আমি বলছি, প্রসন্ন পুরুষও বটে নারীও বটে। সে যখন তার পাওনা-গণ্ডা আদায় করে, তখন সে কাবুলীওয়ালারও কান কেটে দেয়; মঙ্গলা যখন গোঁজ উপড়ে চোঁচা দৌড় দেয়, তখন তার দড়ি গাছটা ধরে' যখন সে তাকে still করে, তখন রামমূর্ত্তির মোটর-গাড়ী ধরা মনে পড়ে; সে পঞ্চাশটা খদ্দেরের দুধের হিসাব, যখন মুখে মুখে করে' দিয়ে balance sheet মিলিয়ে দেয়, তখন তাকে কৃষ্ণলাল দত্তের পাশে স্থান না দিয়ে থাকা যায় না; আর পাড়ায় শ্বাশুড়ী-বৌএর ঝগড়ার বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে, যখন সে পরস্পরের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের বিশ্লেষণ করে', দোষ-গুণের ওজন করে', কোন অদৃশ্য জুরীর সমক্ষে charge দিতে থাকে, তখন তাকে দায়রার জজের আসনে বসাতে ইচ্ছে করে; তারপর, অন্দর-মহলে যখন মেয়েদের মিছিল বসে, সুনীতি-দুর্নীতির বিচার হয়, মেয়ে-পুরুষের চরিত্রগত কত কূট তর্কের বিশ্লেষণ হয়, কতক কথায়, কতক ছড়ায়, কতক কবিতায়, কতক গানে, কতক ইঙ্গিতে-ইসারায়, বোসেদের ঘোষেদের কুণ্ডুদের পালেদের চাটুজ্যে-বাড়ুয্যেদের,—সমস্ত গ্রামটারই, পুরাবৃত্তের আলোচনা হয়, অতীত-বর্ত্তমান কীর্ত্তি-অকীর্ত্তির গবেষণা হয়, তা'তে প্রসন্ন, গয়লা বৌ হ'লে কি হয়, সে democratic সভায়, তার কত জানা-অজানা তথ্যের সম্ভার নিয়ে যখন বসে, তখন সে যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ মহলের বিচার-সভার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তেও সক্ষম, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়ে থাকে। তারপর সে যখন গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে গ্রামের শিব মন্দিরের উঠানে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করে, তার তিন কুলে কেউ নেই, তবুও সে যে কার জন্যে মাথা খোঁড়ে তা বুঝে উঠতে না

জানি ম্লেচ্ছসংস্পর্শে তার spirituality নষ্ট হ'য়ে যাবে এইজন্য। প্রসন্নও, যে পথ দিয়ে সাহেব চলে' যায়, তিন দিন সে সে-পথে চলে না ; লোকে বলে ভয়ে, আমি জানি তার ভয়ের বয়স গেছে, তথাপি পাছে ম্লেচ্ছসংস্পর্শে তার গয়লা-বংশ অপবিত্র হ'য়ে যায় এই আশঙ্কায়। চাষা ভায়া ধানচাল বেচেন pile করে',—ডাল বেচেন ধুলা ও মাটি মিশিয়ে ভারি করে',—পাট বেচেন জলে ভিজিয়ে ; প্রসন্ন দুধ বেচে জল মিশিয়ে, অতএব দুই তুল্য মূল্য। এবং উভয়েই যথাক্রমে গঙ্গাজল ছিটিয়ে গৃহের পবিত্রতা সম্পাদন করেন, এবং লক্ষ্মীপূজা করে', ষষ্ঠীপূজা করে', পুরুত ঠাকুরকে দক্ষিণা দিয়ে আত্মাকে disinfect করেন ; অতএব প্রসন্ন আধ্যাত্মিকই প্রমাণ হ'য়ে যাচ্ছে।

দেশের ব্যবসাদার—মাড়োয়ারী থেকে আরম্ভ করে' চুনোপুঁটি জেলে-মালো পর্য্যন্ত—সবাই "ধর্ম্ম" করেন, পূজা করেন, পাঠ করেন, রামায়ণ শুনেন, কীর্ত্তন করেন, গোমাতার জন্য পিজরাপোল করে' দেন, খট্‌মল্ পিলান,—আর ঘিয়ে সাপের চর্ব্বি মিশিয়ে মানুষ ভাইকে খেতে দেন, দরকার মত গণেশ উল্টান, ব্যবসা চলতি হ'য়ে গেলেই মালে খাট করেন, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, পরের টাকাকে খোলামকুচি জ্ঞান করে' তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন। কামার, কুমার, শেকরা, ময়রা ভাই সকল বিশ্বকর্ম্মার পূজা করেন, হাতুড়ি ছেনি নিক্তি ইত্যাদিকে গড় করেন, আর চোখের আড়াল হ'লেই কাজে ফাঁকি মারেন, ওজনে কম দেন, ভেল্‌সা-ভ্যাজাল চালাতে পাল্লে আর বিশ্বকর্ম্মাকে মনে থাকে না। প্রসন্ন এ সবই যথারীতি করে' থাকে—কে জানে ডোবার জল, আর কে জানে পাতকোর জল, দুধের সঙ্গে

ভয়ে বচ” হ’লেই, পুরুত ঠাকুর আর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। গো-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ত এই বিভিন্ন ব্যবহার বিভিন্ন মনেরই লক্ষণ।

তারপর আহার, আমরা সাত্ত্বিক আহার করে’ থাকি ; ইউরোপীয়গণ যা পায় তাই খায়, কে জানে সাত্ত্বিক, কে জানে অ-সাত্ত্বিক ; আমরা খাই উদ্ভিদ, তারা খায় প্রাণী, এইজন্য আমরা অচল আর তারা সচল প্রাণবন্ত কি না তা আমি বলতে পারচি না ; তবে পশু-পক্ষীর analogy থেকে এটা দেখতে পাই যে, নিছক সাত্ত্বিক আহার খেয়ে, হাতী থেকে আরম্ভ করে’ রামছাগল পর্য্যন্ত, পরের বোঝা বয়, আর প্রাণীবধ করে’ তার রক্ত পান করে’ শেকশিয়ালটা পর্য্যন্ত কারও হুকুমবরদার নয় ; আমরা হয়ত হাতীতে চড়ে’ ইন্দ্রের সভায় গিয়ে উপস্থিত হব, আর ইউরোপীয়েরা পশুরাজের সঙ্গে নরকের আগুনে পুড়ে মরতে যাবে, তা হ’তে পারে ; তা হ’লে আমরা spiritual আর তারা material এইটেই ত প্রমাণ হ’চ্চে !

তারপর আমরা যার-তার হাতে খাই না, অন্ততঃ ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলসখানাও কাঁধে পড়ে থাকা চাই, তবে তার হাতে খাব ; আর ইউরোপীয়েরা যার-তার হাতে খাবে, সে “কিবা হাড়ি কিবা ডোম” । তাদের এমনি materialistic বুদ্ধি যে তারা মানুষে মানুষে প্রভেদ দেখতে পায় না ; মানুষ কি পশু না পাখী যে সব সমান হবে ? অষ্ট্রেলিয়ার steppesএ নাহয় সব ঘোড়া সমান, কিন্তু আড়গড়ার ভেতর পুরলে, ঘোড়ার শ্রেণীবিভাগ হ’য়ে কোনটা ঘোড়-দৌড়ের মাঠে যায়, আর কোনটা scavenger গাড়িতে জোড়া হয় ; মানুষেরও কি তাই নয় ? কিন্তু সে সূক্ষ্মদর্শন ওদের নেই, আমাদের আছে,—আমরা তার ব্যবস্থা করেছি, শ্রেণীবিভাগ করেছি, কারও

স্কুল-মাষ্টার না মোশন-মাষ্টার

স্কুল-মাষ্টার আর মোশন-মাষ্টার একই পদার্থ ; একজন রঙ্গমঞ্চে হস্তপদ সঞ্চালন কর্ত্তে, গর্জ্জন কর্ত্তে শেখান, আর-একজন জীবন-রঙ্গমঞ্চে নানা ভঙ্গীতে নর্ত্তন কুর্দ্দন করতে শিখিয়ে দেন। জীবনটা যে অভিনয় মাত্র, আর অভিনয় ত অভিনয় বটেই, এইটা মাষ্টার-যুগলে যথাক্রমে ছাত্র-গণকে শিখিয়ে থাকেন ; তা'তে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের কোন উন্নতি হ'ক আর নাই হ'ক, "সৎ-সার" অভিনয়টা

বাতুলের গল্প এ জীবন
অর্থহীন মাত্র-বহু-বাক্য-আড়ম্বর,

এই কথার সার্থকতা সম্পাদন করে।

একজন বিশিষ্ট ইংরাজ নট সম্বন্ধে স্তুতিগান করে' বলা হয়েচে—

We loved Hawtrey (Sir Charles Hawtrey) so much because he was "such a lovely liar". He lied with such perfect plausibility and success that —altho' one knew it quite well—one forgot that the whole of the lines had been written for him. He always appeared to be rolling his tarradiddles out from his inner consciousness. Which, of course, was where the art of the man came in.

রসজ্ঞ দর্শক বলচেন—**Hawtrey**র অভিনয় দেখতে দেখতে ভুলে যেতে হয় যে অভিনয় দেখচি ; বাক্য-স্রোতটা তার যেন অন্তরতম সত্তার ভিতর থেকে উথলে উঠচে ; কিন্তু বস্তুতঃ সে আর-একজনের রচিত ছত্রগুলিই আবৃত্তি করচে মাত্র ; এ থেকে বলতেই হয়—**Hawtrey** একজন "lovely liar".

আমাদের স্কুলে (আমি কলেজ বা Post-graduateও তার মধ্যে ধরে নিয়েচি) স্কুল-মাষ্টার এই "lovely-liars" সৃজন করে' সংসার-রঙ্গমঞ্চে ছেড়ে দিচ্ছেন। অভিনেতৃগণের অভিনয় যতই স্বাভাবিক মনে হ'ক না, তাঁদের বক্তৃতা-স্রোত যতই বেগে তাঁদের অন্তরতম সত্তার মধ্য থেকে উৎসারিত হ'ক না, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলবার দরকার নেই যে **"the whole of the lines had been written for him"**.

এই অভিনয়ের rehearsal প্রতিদিন স্কুল-কলেজে হ'য়ে থাকে। স্কুল-কলেজগুলো সে অর্থে—আখড়া ঘর, আর স্কুল-মাষ্টার সুধু—মোশন-মাষ্টার। মেস, ক্লাব ইত্যাদিতে যে "সাঁঝে সকালে" তর্ক-বিতর্ক—সানইয়াট সান থেকে C. R. Das পর্য্যন্তকে নিয়ে যে তর্ক-কচ্‌কচি,—ত [illegible] olitics, স্বদেশী, Non-co-operation, এ স [illegible] হয়—সে কেবল part মুখস্থকরা মাত্র। যে [illegible] ক্তৃতা ইত্যাদি জীবন-রঙ্গমঞ্চে অভিনয়েরই সহায়তা করে' থাকে।

আমি সেদিন এক M. A. ছাত্রের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম, তিনি **Economics** নিয়েচেন ; তাঁকে প্রশ্ন কল্লুম—বাপু এই যে Fiscal Commission [illegible] রা কি মীমাংসা কল্লে কিছু জান ? বাছা

—এই দুটাতে মিলচে না বলে' আমাদের শরীরে বায়ুর প্রে
বেশী হ'য়ে উঠেচে। সকলেই জানেন নট-নটী মাত্রেই একটু
neurasthenic—একটু বায়ুগ্রস্ত। উক্ত পণ্ডিতের মতে
lema
মধ্যে a real sense of independence in both thought and action আনতে হবে, তা হ'লেই বায়ুর সমতা হ'য়ে আমাদের **actual** lifeএর সঙ্গে আমাদের ideas মিলে যাবে।

পণ্ডিতজী রোগটা ধরেচেন ঠিক, আর দাওয়াইও ঠিক বাত্‌লেচেন; কিন্তু সম্পূর্ণ দাওয়াইটা বাত্‌লান নি। নূতন idea এসে আমাদের বহু-বার আক্রমণ করেচে, সিকন্দর থেকে আরম্ভ করে' বুদ্ধ চৈতন্য পর্য্যন্ত অনেকবার নূতন idea আমাদের ঘা দিয়েচে—কিন্তু সে সব ideaকে আমরা আপনার করে' নিয়েচি—আমাদের জীবনের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিয়েচি—কিন্তু এখন আর পাচ্চি না কেন? তার উত্তর, জীবন ছিল তাই আয়ত্ত করেছি—বিষ খেয়েও নীলকণ্ঠ হ'য়ে বেঁচেছিলুম—বেদ ছেড়ে বৌদ্ধ হ'য়েও সসাগরা পৃথিবী জয় করেছি—এখন জীবন নেই, তাই বাহিরের জিনিষ আর ভেতরে যায় না, রক্তের সঙ্গে মেশে না—এ যেন মড়ার গায়ে injection করা—যেখানকার injection সেইখানেই থাকে।

এখন বাঁচার উপায় কি? বাঁচার উপায় independence in both thought and action; কিন্তু সে independence আসে কোথা থেকে? চিন্তার স্বাধীনতা কতক সম্ভব, কিন্তু কার্য্যের স্বাধীনতার ক্ষেত্র কোথায়? সত্যিকারের কার্য্যের ক্ষেত্র নেই, তাই অভিনয় করে' দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হচ্চে।

১৯শে ভাদ্র, ১৩৩০

এই বহু পুরাতন প্রবচনের মধ্যে gentlemanত্বের সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ত্তমান রয়েছে। মাটি খুঁড়ে যখন পুরুষমাত্রেই শস্য উৎপন্ন করত আর স্ত্রীমাত্রেই চরকায় সূতা কাটত, তখন সমাজে gentlemanএর কোটায় কেউ ছিল না; তখন gentlemanএর সৃষ্টিই হয় নি। Gentlemanটা একেবারেই খুব হালি জিনিষ। কেউ কেউ বলেন ওটা খুব বাজে জিনিষ—সভ্য-সমাজ-যন্ত্রের একটা অনাবশ্যক bye-product মাত্র।

কেউ কেউ বলেন gentlemanএর জাত নেই; অর্থাৎ সমাজের যে-কোন শ্রেণীর ভিতরে gentleman পাওয়া যেতে পারে। এ কথা আর যে-কোন দেশে সত্য হ'ক, আমাদের দেশে হ'তে পারে না। যাদের বামুন-শূদ্র জ্ঞান আছে, অর্থাৎ হ্রস্ব-দীর্ঘ বোধ আছে, তারা একথা কোনক্রমেই মানতে পারে না। যারা ছাতু খায়, বা পকাল ভাত, বা পরিষ্টি ভাত খায়, মালকোছা মেরে কাপড় পরে, বা পাঁচি ধুতি পরে', সুধু পায়ে, সুধু গায়ে থাকে, তারা কি gentleman হ'তে পারে?

আমি কলকাতায় এক মেসে দিনকতক বাস করে' এসেছি—মেসের পাশে একটা মস্ত তেতলা বাড়ীতে এক মস্ত ধনী পরিবার বাস করতেন, তেতলা ঘরের জানলায় অনেক সময় মা-লক্ষ্মীরা একটু বে-আবরু ভাবে দাঁড়াতেন বসতেন,—২০।২৫টা ওরম্বা যুবাকে ভ্রূক্ষেপ না করে'। একদিন শুনা গেল এক বৃদ্ধা ঝি, বাতায়নে দণ্ডায়মানা এক যুবতীকে বলচে.—সরে এস, মেসের ছেলেগুলোর সুমুখ থেকে—

যুবতী। ওদেরকে আবার লজ্জা কিসের? ওরা যে বাসাড়ে,—ওরা ঝি না এলে বাসন মাজে, ঠাকুর না এলে রাঁধে। ওদের দেখে বুঝি আবার লজ্জা করতে হবে?

মা-লক্ষ্মী বোধ হয় gentlemanকে লজ্জা করতে প্রস্তুত, কিন্তু যারা ঝি-চাকরের মত বাসন মাজে বা রাঁধে তারা কি gentleman হ'তে পারে? ঠিক বলেচেন মা আমার!

কিন্তু কথা হচ্চে এই যে—লাঙ্গল ঠেললে, আর চরকা কাটলেই, এবং উপরোক্ত মাতাঠাকুরাণীর হিসাব-মত বাসন মাজলে বা রাঁধলেই যদি gentleman সম্প্রদায়ের নীচে যেতে হয়, তা হ'লে সে সব কাজ না করে' যদি দিনগুজরাণ হয়, তা হ'লেই কি gentleman হওয়া চলে?

এই ধরুন,—চোর-ডাকাতের কথা বাদ দিয়ে—আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, আমার জমী নেই, জমা নেই, ব্যাঙ্কে টাকা নেই, মাথায় যে খুব বুদ্ধির প্রাচুর্য্য আছে তা'ও নয়, আমি আকাশের পাখী, বনের পশু ও জলের মাছের মত do not sow, nor do I reap—আমি মাটি কাটি না, চরকা ত কাটিই না (গান্ধীজীর হুকুমেও নয়, কিম্বা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হ'য়েও নয়), চুরি-চামারী ও করি না—অথচ আমার পেট চলে, নির্ভাবনায় দিন কেটে যায়, আমি gentleman কি না? ইংরাজিতে mendicant বলে' একটা কথা আছে, আমাকে হয়ত সেই শ্রেণীরই ভেতর ফেলা হবে; তা হ'লেই বিচারটা একটু জটিল হ'য়ে আসচে—

আমি কিন্তু প্রমাণ করে' দেব যে, ঐ mendicant আর gentleman এই দুইই এক শ্রেণীর জীব। উভয়েই চাষ করে না, মুদিখানার দোকান করে না, চুরি করে না, অথচ পায়ের উপর পা দিয়ে বসে' খায়। উভয়েই নির্ভাবনা, কিন্তু উভয়েই ভিক্ষুক। জমীদার ভিক্ষা করে খাজনা, আর ভিক্ষুক ভিক্ষা করে অনুগ্রহ; একজন জোর করে' চাইতে পারে, আর-একজন আস্তে চায়, ভয়ে ভয়ে চায়—এই তফাৎ।

অর্থসম্পত্তি এসকলের সমবায়েও নিরুপদ্রব অসহযোগ কোন কাজেরই হ'ল না। রুরের শ্রমিকদের অর্থ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার খরচ আর জার্ম্মাণি যোগাতে পাল্লে না; soul-forceএর অভাব হয় নি, শেষে অর্থের অভাবেই সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। প্রতি সপ্তাহে ৩৫,০০০ trillion marks হিসাবে অর্থ আর জার্ম্মাণি যোগাতে পাল্লে না, অসহযোগের অবসান হ'য়ে গেল। যাঁরা জার্ম্মাণ যুদ্ধের ইতিহাস পর পর দেখে এসেচেন, তাঁরাই বলবেন জার্ম্মাণি যে দিন হটে গিয়ে Hindenberg lineএর পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করে' নিশ্চল হ'য়ে বসল, সেই দিনই তার পরাভব হ'য়ে গেছে—তারপর যতদিন যুদ্ধ চলেচে ততদিন সে ভেঙ্গেই পড়তে চলেচে; Versailles সন্ধিতে তাকে একবারে নখদন্তহীন করে' রেখে ফেলা হ'ল; ফ্রান্সের দাবী মেটাতে সে পারলে না, বা চাইলে না—যাই বলুন, তারপরই রুর দখল হ'ল ও সেই সঙ্গে নিরুপদ্রব অসহযোগ আরম্ভ হ'ল। ফ্রান্সের টাকা দিতে বাধ্য হ'লে জার্ম্মাণির যে দুর্দ্দশা হবে, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল, এই ভেবে জার্ম্মাণ-জাতি নিরুপদ্রব অসহযোগকে বরণ করে' নিয়েছিল; কিন্তু নিরস্ত্রের সে অস্ত্রও নিষ্ফল হ'ল। জার্ম্মাণিতে আজ সে নিষ্ফলতার ফল হয়েচে—অরাজকতা, আর খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ভেঙ্গে পড়া।

যুদ্ধ-শাস্ত্রের একটা আইন আছে—Victory can only be won as the result of offensive action; এ সত্য সকল যুদ্ধেই প্রমাণিত হ'য়ে গেছে, এ কথার যাথার্থ্য সকল তর্কের অতীত হ'য়ে রয়েচে। অসহযোগ একটা প্রতিষেধক defensive action মাত্র। এ defensive action থেকে জয়শ্রী লাভ করা যেতে পারে না।

অসহযোগ একটা মাঝামাঝি পথ—সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র—তা' থেকে জয়শ্রীলাভ কেউ কখন করতে পারে নি।

আমি একথা বলতে চাই না যে অসহযোগ-নীতি অবলম্বিত হয়েচে বলে' আমাদের দেশেও আমি "নাশংসে বিজয়ায়"—তার দুটি কারণ, প্রথম, আমি ভবিষ্যদ্বক্তার আসন গ্রহণ করতে মোটেই রাজি নই; দ্বিতীয়, East is East and West is West—প্রতীচ্যে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে বলে' প্রাচ্যেও তাই হবে কে বলতে পারে?

২৩শে আশ্বিন, ১৩৩০

যদি

"যদি" দিয়ে হাতী কেনা যায়, এ কথা নতুন নয়। যদি আজ আমি রাজতক্তে বসতে পাই—এমনকি, তারকেশ্বরের ফাঁকা গদ্দিতে আসন পাততে পাই, ত আমি একটা ছেড়ে দশটা হাতী কিনতে পারি; এ সহজ কথাটা বুঝতে তোমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নয়। তবে এই "যদি"র পর একটা নিদারুণ "কিন্তু" এসে পড়েই—আর হাতী ছেড়ে একটা রামছাগল কেনাও অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, এই বা মুস্কিল!

তবে এই "কিন্তু"র উপর আর একটা "কিন্তু" আছে; সেটা হচ্চে এই যে, আমরা যখন এই "যদি"র নেশায়—এই সম্ভাবিতের দিবাস্বপ্নে মজগুল্ হ'য়ে থাকি, তখন "কিন্তু"র কথাটা, অর্থাৎ তারকেশ্বরের ফাঁকা গদিতে বসবার প্রতি অন্তরায়টা, খুব প্রকট হ'য়ে আমাদের স্বপ্নের ব্যাঘাত ঘটায় না; তখন কথাটা দাঁড়ায় এই—যদি আমি রাজা হই, হাতী কিনতে পারি, কিন্তু রাজা হচ্চি না, কিন্তু যদি হই ত কিনতে পারি ত, এই বলে' "যদি"র উপর একটা প্রবল দমক দিয়ে প্রথম "কিন্তু"র খোঁচাটা ভুলে যাই। এ "কিন্তু" দিয়ে "কিন্তু"র মার—যেন কণ্টকেন কণ্টকোদ্ধরণম্।

এই "যদি" আর "কিন্তু"র মারপেঁচে আমরা এখন স্বরাজ্যরূপ

—মৌলিক নয়; তাই তিনি এই বহুত্বের মধ্যে একের সন্ধান করে' দেখালেন—বিশ্ব এক, যেহেতু আত্মা এক—সেই এককে উপলব্ধি করতে পারলেই বহু এক হ'য়ে যাবে।

এই একীকরণের চেষ্টায় তত্ত্বদর্শী মানুষকে তত্ত্বদর্শন করতে শিখালেন —যে তৃতীয় নেত্রে মায়ার আবরণ ভেদ করে' সে তত্ত্বদর্শন সম্ভব হয়, সেই তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করবার জন্য পরপর বহুতর অনুশীলনের স্তর উদ্ভাবিত করলেন। এই অনুশীলনের পর্য্যায়ের নাম হল ধর্ম্ম, সংস্কার, যোগ ইত্যাদি;—কিন্তু সেই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় এক হলেও, তিনিও "বহু স্যাম্"; তাই আজ যত দেশ তত ধর্ম্ম, দেশে যত জাতি তত ধর্ম্ম, জাতিতে যত গোষ্ঠী তত ধর্ম্ম, গোষ্ঠী মধ্যে যত লোক তত ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্ম দিয়ে বহুকে এক করা কোনো যুগে কোনো দেশে হ'ল না—আমাদের দেশেও নয়।

আমাদের দেশে ছিলেন হিন্দুধর্ম্ম;—কালে তিনি বহু হলেন; তারপর এলেন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম, তাঁরাও বহু হলেন; তারপর এলেন মুসলমান ধর্ম্ম;—তিনিও অখণ্ড রইলেন না; তারপর খৃষ্টান ধর্ম্ম;—তাঁরও অনেক শাখা-প্রশাখা। এত ধর্ম্ম-বাহুল্যে একত্ব আসে কোথা হ'তে! ধর্ম্ম মানুষটাকে হয়ত বাঁধতে, সংযত করতে পারে; জাতিটাকে—ভারতীয় মনুষ্যগোষ্ঠীকে সমগ্রভাবে ধরে' আটি বাঁধে কি প্রকারে? সুতরাং আত্মাই এক হ'ক, আর পরমাত্মাই এক হ'ক—মানুষ ধর্ম্মের দিক দিয়ে বহু হয়েই আছে ও থাকবে।

তবে উপায় কি? হিন্দুকে বাঁধতে গেলে মুসলমান রাগ করে, আবার হিন্দু-মুসলমানকে বাঁধতে গেলে হিন্দু-মুসলমান ছাড়া যে তৃতীয় সম্প্রদায়, হয় সে চেষ্টাকে হেসে উড়িয়ে দেন, নয় ত রাগে গর্‌গর্

হাসপাতালে মরেছেন। হিন্দুর গোঁড়ামী তাঁর ক্ষুধাবৃদ্ধি করেছিল, খৃষ্টান ধর্ম্ম তা নিবারণ করে নি।

অতএব এই ক্ষুধার সেবা কর তবেই একত্র মিলবে, এবং একত্র মিললেই বাঁচবে। যদি ক্ষুধার ডাকে সাড়া দিতে পার, ত সে মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়ারই মত শুনাবে; কেননা মা আমাদের ক্ষুধারূপিণী; —এই তেত্রিশ কোটির ক্ষুধা যদি মায়ের ক্ষুধা না হয়, তবে সে আমাদের মা নয়!

আজ ১৪ই জুলাই, ১৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র ফরাসী জাতি এই ক্ষুধার ডাকে সাড়া দিয়েছিল; আবালবৃদ্ধবনিতার জঠরাগ্নি বাড়বানলের রূপ ধারণ করে' অনাচার অত্যাচারের বিশাল বারিধিকে পরিশুষ্ক করেছিল; সেটা ফরাসী-মায়ের ডাকেরই মত শুনিয়েছিল। বুভুক্ষিত ফরাসী আবালবৃদ্ধবনিতা যে Come children of the father-land, the day of glory is come বলে' সমস্বরে গেয়ে উঠেছিল সে স্তোত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির সম্ভাবনা-জনিত উল্লাসেরই অভিব্যক্তি মাত্র; তারা day of glory না বলে' day of feasting বললে ভাবগত বৈষম্য কিছুই হত না! অতএব 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' এই ঋষিবাক্যের যে উত্তর বুভুক্ষিত নিপীড়িত মানুষ যুগে যুগে প্রদান করেচে, যদি সেই উত্তর সমস্বরে দিগন্ত-বিদারী বজ্র-নির্ঘোষে দিতে পার, তবে তুমি আহিত-জঠরাগ্নি অফুরন্ত হব্যের সঙ্গে সঙ্গে অফুরন্ত কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।

যদি বল পেটের ক্ষিদেকে patriotism করে' তুললে, কথাটা ভাল শুনায় না;—কিন্তু কখনও জিনিষটাকে তলিয়ে বুঝেচ কি? যে-কোন-দেশে, যে-কোন-যুগে মানুষের যে-কোন-চেষ্টা, সবই ক্ষুন্নিবৃত্তির

"খুঁজি খুঁজি নারী"

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দারাঃ সংপ্রাপ্তিহেতবঃ ইতি স্মৃতিঃ ; ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মূলমুত্তমম্ ইতি চরকঃ। চতুর্ব্বর্গ লাভের এই দুই শাস্ত্রোক্ত পথ ; ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এই দুই পথ আবিষ্কার করে-ছিলেন। চতুর্ব্বর্গের মূল যে রোগহীনতা সেটা আবিষ্কারের জন্য ত্রিকালজ্ঞ না হলেও ক্ষতি ছিল না ; কিন্তু দারা যে চতুর্ব্বর্গের সম্প্রাপ্তি-হেতু সে কথাটা ত্রিকালজ্ঞ ঋষির দোহাই না দিলে আর ঠিক গলাধঃকরণ করা যেত না। কারণ অতীত ও বর্ত্তমানের অবস্থা হ'তে উক্ত বচনের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছে বলে' মনে হয় না। ভবিষ্যতের মুখচেয়ে থাকতেই হয়েচে।

আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, আমার বঁধু মিলে নাই, অতএব আমার কথা কেহ প্রত্যক্ষদর্শীর কথা বা ভুক্তভোগীর কথা বলে' গ্রহণ করবেন তা আমি সাহস করে' বলতে পারি না; তবে বঁধুহীন হলেও আমার কথাগুলা খুব অনাস্থার যোগ্য বলে' মনে করবারও যথেষ্ট কারণ নেই, কেননা ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ হ'লেও কুলযোষিৎগণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না একথা সত্য, এবং ছিলেন না বলেই হয়ত ত্রিকালজ্ঞ হ'তে পেরেছিলেন।

বৃদ্ধ কমলাকান্তেরও বিবাহের কাল আসিয়াছিল, এখন চলিয়া

বেদীবিমধ্যা যদি পঙ্কজাক্ষী
কুলেন হীনাপি বিবাহনীয়া ॥

ত্রিকালজ্ঞ ঋষির আদেশ না থাকলেও উপরোক্ত লক্ষণে লক্ষণাক্রান্তা সুকন্যার অনুমোদন সকলেই করতেন—ঋষিবাক্যে নিঃসংশয়ে করবেন এইমাত্র প্রভেদ। অর্থাৎ লোকের চোখ বলে' একটা জিনিষ আছে; ঋষিগণের যেমন আছে, ঠিক তেমনিই; সেই চোখের জোরেই সে বিচার—সুন্দর অসুন্দরের বিচার, মানুষ করে' থাকে। কিন্তু সুন্দর অসুন্দর ছাড়া, সু আর কু বলে' যে জিনিষ আছে, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের তা জানা ছিল বলে' লোকের ধারণা। সব সুন্দরই সু নয়, এবং সব অসুন্দরই কু নয়; সু কু ঘটিত এই যে জটিল হেঁয়ালী তার পূরণ কল্পে কন্যা সম্বন্ধে ঋষিগণ কত নির্দ্দেশটাই, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে, চক্ষুষ্মান হলেও, খুব প্রয়োজনীয় বলে' লোকে মনে করে। ঋষি শাতাতপ একস্থানে বলেচেন—

হংসস্বনাং মেঘবর্ণাং মধুপিঙ্গললোচনাম্'।
তাদৃশীং বরয়েৎ কন্যাং গৃহস্থঃ সুখমেধতে ॥

—হাঁসের মত ডাক, মেঘের মত বর্ণ, বেরালের মত চক্ষু, এমন কন্যাকে, ঠিক ত্রিকালজ্ঞ না হলে, বরণীয়া বলে' মনে করবার কথাই নয়।

অবরেন্যা কন্যা সম্বন্ধে মনু বলেচেন—

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং
নাধিকাঙ্গীং ন রোগিনীম্।
নালোমিকাং নাতিলোম্নীং
ন বাচালাং ন পিঙ্গলাম্ ॥

আমি সেই অবধি অন্বেষণ ত্যাগ করেছি; আমি বুঝেচি এ পথহীন ভ্রমণের শেষ নাই, তাই ত্রিকালজ্ঞ না হয়েও ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের তৃতীয় পথ—সহজ পথ—একটা আমার সুমুখে খুলে' গেছে, সেইটার সাধনা বাকী ক'টা দিন করে' যাব।

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৩০

পিতা অবাক—যদিও অবাক হবার কথা নয়; আইন করে' মানুষের মনকে বাঁধতে গেলে এমন বিপরীত ফল ফলবেই। আরও অবাক হবার কথা নয় এইজন্য যে, চোখ চেয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, নিশিদিন এই কাজই চলেচে—বেরাল মেরে ইঁদুরকে বাঁচান, চাষী মেরে জমিদারকে বাঁচান, কুলি মেরে কুঠিয়ালকে বাঁচান, বিদেশীকে মেরে স্বদেশীকে বাঁচান, গরীব মেরে ধনীকে বাঁচান—মঙ্গলার বাছুরকে মেরে কমলাকান্ত বামুনকে বাঁচান, —এইত আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তম্ চলেইচে। এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

দুনিয়া জুড়ে এই যে বিশাল দ্বন্দ্ব চলেচে, এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের, এক জাতের সঙ্গে আর এক জাতের, এক বর্ণের সঙ্গে আর এক বর্ণের, এর মধ্যে একজনকে মেরে আর একজনকে বাঁচাবার আয়োজনই চলেচে। তুমি মর আমি বাঁচি, এই হল মূল কথা। তুমিও বাঁচ আমিও বাঁচি, তার জন্য স্বর্গের সৃষ্টি হয়েচে। এই ধরাপৃষ্ঠে একজনকে মেরেই আর-একজনকে বাঁচতে হবে। কিন্তু সেই মূল অভিসন্ধিটা খুব চতুর উপায়ে আবৃত করে' রাখবার ব্যবস্থাও করতে হবে—সেই আবরণের নাম civilization.

সিংহ ক্ষুধার তাড়নায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বনের হরিণীর উপর, সেটা হ'ল সিংহের সহজ অনাবৃত পশুভাব। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ আস্ত মানুষকে খেয়েচে, এখনও খায়, সেটাও মানুষের সহজ উলঙ্গ পশুভাব; সে মানুষকে বলে বর্ব্বর, savage! কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় কাঁচা মানুষ না খেয়ে, যখন মানুষ উঠান চসে', আর ঠিক রক্তপান না করে', তার ধানের মরাই খালি করে' নিয়ে যায়, সে বেচারা না খেতে পেয়ে

মরে, আর তার নাম দেয় exploitation বা অবাধ বাণিজ্য, তখন সে লুণ্ঠনকারী হয় civilised.

নির্জীব, নিরীহ, গরীবকে exploit করবার জন্যই বলবান তেজীয়ান ধনবানের জন্ম। গরীব দুটা মিষ্টি-কথার কাঙ্গাল; দুটা মিষ্টি-কথায় ভুলে সে বলবানের বোঝা কাঁধে তুলে' নেয়। সে ভারবাহী হয়েই জন্মেচে, ভার বইতে বইতেই সে একদিন পথের প্রান্তে তার ভারাক্রান্ত জীবনের অন্ত করবে; তারপর আর-একটা শর্করাবাহী ঋষভ তার বোঝা স্ব-ইচ্ছায় পৃষ্ঠে তুলে' নিয়ে বলবান ধনীর কষাঘাতে এ বন্ধুর জীবন-পথে চলতে চলতে গরীবের "পরমা আবৃতি"কে প্রাপ্ত হবে। এই রকম জীবন-মরণের প্রবাহ কালসিন্ধুনীরে অনন্তকাল ধেয়ে যাবে।

সাগর ছেঁচে মাণিক তুলে' আনে, খনির গর্ভ থেকে মণি তুলে' আনে, গরীব—ধনীর কণ্ঠহার রচিত হবে বলে', আর তার নিজের একমুষ্টি অন্ন জুটবে বলে'। ধনীর ধনবৃদ্ধির জন্য, দৃপ্ত অহঙ্কারের চরিতার্থতার জন্য, যুদ্ধ বাধে, দরিদ্রের প্রাণ যায়। প্রাণ গেল ত ফুরিয়ে গেল; মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়,- যখন তার হাত-পা গুঁড়িয়ে যায়, চক্ষু অন্ধ হয়, আর সেই ধনীর দ্বারে অন্ধ পঙ্গুর পাল ভিক্ষান্নের জন্য উপস্থিত হ'লে, নির্ম্মমভাবে বিতাড়িত হয়;—যখন নারী পতিহীনা, পুত্রহীনা হ'য়ে, দেহের বিনিময়ে উদরের অন্ন সংগ্রহ করে;—শিশু যখন স্তন্যের অভাবে মুকুলেই শুকিয়ে ঝরে' পড়ে। কিন্তু এ বীভৎসমূর্ত্তি সভ্যতার ঢেকে রাখবার জন্য জয়স্তম্ভ তার নির্লজ্জ শির উত্তোলন করে' দাঁড়ায়, জয়গানের কোলাহল মুমূর্ষুর বুভুক্ষিতের ক্রন্দনের রোলকে নিমজ্জিত করে, বিদীর্ণ বক্ষের উপর সোনার পদক

সুসভ্য সমগ্র ইউরোপকেও দেখেচি—ভগবানকে Lord of Hosts আখ্যা দিয়ে সমরাঙ্গনে তাঁকে ঠিক লড়াই করতে না ডাকলেও, যুদ্ধারম্ভে তাঁর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে' গির্জ্জায় গির্জ্জায় পূজার ব্যবস্থা করতে, এবং যুদ্ধশেষে জয়লাভের জন্য Thanksgivingএর আয়োজন করতে ; সে আয়োজনকে কিন্তু বর্ব্বর বলবার জো নেই ! কিন্তু এই গির্জ্জায় গির্জ্জায় উপাসনা ও Thanksgivingএর মূলকথা কি ?—**Give us this day our daily bread !**

কাব্যকলাও তাই। আমি দেখি গীতগোবিন্দ থেকে সুরু করে' "গোপালে উড়ে" পর্য্যন্ত—স্মরগরলখণ্ডনং ইত্যাদি থেকে, "ঐ পোহাল, রূপসি, নিশি" পর্য্যন্ত, কামানলের আহুতির কথাই ছন্দোবদ্ধ হ'য়ে সংগীত হয়েচে। সব রসের আদি আদিরস ; এটা একটা আকস্মিক নিরর্থক শ্রেণী বিভাগ নয়। তবে তাকে ঢাকতে পারলেই কাব্য, না ঢাকতে পারলেই কাম। শীলতা বা শ্লীলতা এই ঢাকাঢাকির উপর, পর্দ্দার সরু মোটার উপর, নির্ভর করে—পর্দ্দার ভিতরের বস্তুর উপর নহে, কেননা সে বস্তু সব ক্ষেত্রে একই। আদি মানব যখন অশ্বত্থপত্র দ্বারা তার আদি নগ্নতাকে ঢাকবার চেষ্টা করেছিল, অনাবৃত দেহে ভগবানের সমক্ষেও এসে দাঁড়াতে লজ্জা বোধ করেছিল, তখন থেকেই সে civilized হ'তে সুরু করেচে, অর্থাৎ আবরণের মাহাত্ম্য অবগত হয়েচে।

কেউ কেউ বলেন পশুভাবাপন্ন হ'য়ে মানুষ মানুষের হিংসা করে ; সাত্ত্বিকজীবন যাপন করতে মানুষ যদি শেখে তা হ'লে পশুত্বের বদলে তার দেবভাবই ফুটে উঠবে। আমি সে কথা বিশ্বাস করি না ; সমগ্র মানবজাতির অতীত ইতিহাস আলোচনা করে' দেখলাম যে

সত্যযুগ

কেউ বলতে পার এই সত্যযুগের কল্পনা মানুষ কোথাথেকে পেয়েছিল ? এই সংসারের হাসিখেলা কান্নাকাটি কি অসত্য ?

সত্যযুগটা কবে তার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ নিয়ে সপ্রকাশ হয়েছিল তা' নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ সেই পরম রমণীয় যুগটা সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই, কেউ কেউ তারই কিছু পরে, কেউবা এই সেদিন আবির্ভূত হয়েছিল বলে' মনে করেন।

সবদেশেই এক একটা স্থান চিহ্নিতনামা করা আছে যেখানে সত্যযুগের নরনারী বিহার করেছিলেন, পূর্ণ সরলতা, পূর্ণ সত্য, পরিপূর্ণ সুখ নিয়ে তাঁরা স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্ত্যের পার্থক্য তুলে' দিয়ে, এক রকম দেবতাদেরই মত এই ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করতেন।

কোন্ গিরিদরীবেষ্টিত উপত্যকার বক্ষস্থলে ফল ফুল প্রস্রবনের মেলা, তার মধ্যে—আদি নর ও আদি নারী মানবজাতির আদি জনক-জননী, পরিপূর্ণ আনন্দে বিহার করতেন ; অমরার দূতগণ নেমে এসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতেন ; কখনও স্বয়ং ভগবান এসে তাঁদের প্রফুল্ল কুসুমোদ্যানের দ্বারে অতিথি হতেন। স্বর্গের হাওয়া মর্ত্ত্যে বইত, স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্ত্যের সাক্ষাৎ আদান-প্রদান হ'ত—সে একদিন ছিল ! কাঁটা গাছে কাঁটা ছিল না, শৃঙ্গী, নখী, দংষ্ট্রীগণের শৃঙ্গ-নখ-

যদি কেউ তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে তা হ'লে বুঝতে পারে—যে শৈশব গিয়ে যখন কৈশোর এসেচে—যৌবনের বার্ত্তা নিয়ে, ঊষার রাগ যেমন দিনের আলোর বার্ত্তা নিয়ে আসে—তখনই তার জীবনের সত্য-যুগের সূচনা হয়েচে। যখনই তার এই দেহরূপ দেবমন্দির সুগঠিত সুন্দর হয়ে উঠেচে, আর সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতা জাগ্রত হয়েচেন তখনই তার সত্যযুগ এসেচে। এই বিশ্বচরাচর তখন তার চক্ষে নিষ্পাপ, জরাব্যাধির বিভীষিকা তার সরল সতেজ কল্পনার বাহিরে, দুঃখ-শোক, তার ভৃত্য ; নদীর কলনাদ, পাখীর কলধ্বনি, বায়ুর নিঃস্বন, সকলই সুমধুর সঙ্গীতের ঝঙ্কারের মত ; তার সাহস তখন অপরিমিত, তার বল তখন সকল বিঘ্ন-বিপত্তিকে ছাড়িয়ে উঠেচে, তার বুকের প্রশস্ত বিস্তারের মধ্যে সে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে স্থান দিতে পারে—এই তার সত্যযুগ, এই তার স্বর্গ, তার বৈকুণ্ঠ।

তারপর তার দেহের তেজ যখন নিভে আসে, তার রক্তের গতি যখন মন্থর হয়, তার হৃদয়ের বিস্তার যখন কুঞ্চিত হ'য়ে আসে, তখনই তার সত্যযুগের অবসান হয়ে. ত্রেতা দ্বাপর ক্রমে কলি এসে উপস্থিত হয় ;—বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে সন্দেহ, সাহসের পরিবর্ত্তে ভয়, সহৃদয়তার পরিবর্ত্তে স্বার্থ, চরিতার্থতার পরিবর্ত্তে আশা এসে তাকে ক্ষুদ্র নিস্তেজ করে' ফেলে। বৎসর গুণে এ সত্যযুগের নির্ণয় হয় না ; কার কোন্ বয়সে পরিপূর্ণ দেহ মন ফুটে উঠবে কেউ বলতে পারে না, আর কতদিনই বা প্রস্ফুটিত থাকবে তা'ও কেউ বলতে পারে না। কারও কারও এই যৌবন এই সত্যযুগ আসে, আর যায় না ; স্থির যৌবনের কথা গল্প নয়, অনন্ত মহাপুরুষগণের সত্যযুগের অবসান হয় না—তাঁরা চিরযৌবন ভোগ করেন—একথা আমি মানি। কিন্তু সকলের কি এই সত্যযুগ

আগে-পিছে

বিচি থেকে গাছ, কি গাছ থেকে বিচি, ডিম্ থেকে মুরগী, কি মুরগী থেকে ডিম্—এ হেঁয়ালীর আজ পর্য্যন্ত মীমাংসা হ'ল না। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পিছে সব সময় ঠিক করে' উঠতে পারা যায় না বলেই দুনিয়ায় বহুত জটিল প্রশ্নের আজও উত্তর মিলল না। আফিম খেলে তারপর মৌতাত, আফিম না খেলে তারপর বেয়াড়া, এ পারম্পর্য্যটা যত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য সেই রকম যদি আমাদের জোটপড়া শতগ্রন্থি জীবনরূপ সূতার নুটিতে (tangled skein of life) একটা স্পষ্ট পারম্পর্য্যের সন্ধান মিলত অর্থাৎ 'থাই' পাওয়া যেত, তা হ'লে জীবনটা মৌতাতীর জীবনের মতই সরল সহজ স্পষ্ট হ'ত, তার কোন ভুল নেই।

কিন্তু এই আগে-পিছের সন্ধান পাওয়া যাচ্চে না বলে' পদে পদে গোল বাধচে। দেশের যাঁরা মাথা তাঁরা বলচেন -- দেশের লোক পেট ভরে' খেতে পাচ্চে না, অতএব আগে দেশের লোকের উদরান্নের ব্যবস্থা কর তারপর অন্য কথা। আগে ক্ষিদের উপায় কর তারপর আর কিছু—যাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি হ'য়ে লোকের টেঁকে পয়সা হয়, তার ব্যবস্থা কর, তা হ'লেই ক্ষিদে মিটবে আর কোন দুঃখ থাকবে না। এটা মাথাওলাদের কথা হ'লেও—আমি স্থিরমস্তিষ্কের কথা বলে' গ্রহণ করতে পারলাম না।

বা রুষিয়ার নরনারী কি তাদের ঘাড়ের জোয়ালটা নামাবার জন্য স্কুল মাষ্টারের শরণাগত হয়েছিল? ফ্রান্সের বা রুষিয়ার নিপীড়িত নরনারী কি যথাক্রমে রুশো ভলত্যার হজম করে', বা ম্যার্কস্ বা কুরোপাট্‌কিনের theory হজম করে', তবে বাস্তিল ভাঙ্গতে অগ্রসর হয়েছিল—না Kronstadt দুর্গ অধিকার করে' বসেছিল? আমি জানি তা করে নি, কেননা ফরাসি বিপ্লবের পূর্ব্বে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল না। অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ছিল, রুষিয়ারও তাই। আর আমার বিশ্বাস নিরক্ষর ছিল বলেই অত বড়, অমন বিরাট কার্য্যটা এক কথায়, সহজ বুদ্ধিতে করে' ফেলেছিল—পড়াশুনা থাকলে হয়ত তত্ত্বজ্ঞান আসত, ইহকাল ফেলে, পরকাল নিয়েই কাল কাটাত, আর সর্ব্বধর্ম্মের মূল আধা সত্যটাকে, অর্থাৎ "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ", এই কথাটা আঁকড়ে ধরে' থাকত। আমি এত বড় কথাটা বলে' ফেল্লুম হয়ত লোকে আমাকে ছিছি করবে—কিন্তু আমার তা'তে ব'য়ে গেল। আমি বলি মার খেয়ে চুপ করে' থাকা ভগবদভিপ্রেত তখনই হবে, যখন সেই মারাটা ভগবৎপ্রেরণা হবে; আমার অহিংসা তখনই ধর্ম্ম হবে যখন আমার প্রতি যে হিংস হ'য়ে উঠেচে সে ভগবদভিপ্রায় অনুযায়ীই হিংস হয়েছে। তার মারটা যদি ভগবানের অনভিপ্রেত হয়, তবে আমার প্রতিমারটা নিশ্চয়ই অভিপ্রেত হবে। সুতরাং অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ তখনই—যখন হিংসাটা পরমো ধর্ম্মঃ, নহিলে নয়।

এ কথায় লোকে আমায় গালি দিক তা'তে আমার এসে যায় না, কেননা গালি যুক্তি নয়, যুক্তির অভাবজনিত গাত্রদাহের ঝাঁজ। সে ঝাজ আমি সহ্য করতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু যুক্তির তহবিল খালি হ'য়ে গেলেও যে মানুষ তর্ক করে সেটাই অসহ্য। তারা তথাপি তর্ক

মকরধ্বজ

মানুষ ব্যাধি জরা মৃত্যুর বেড়াজালে বেষ্টিত ; এ ত্রয়ীর অপেক্ষাও অধিকতর বেদনার নিদান যে পেটের জ্বালা, তারও জ্বালায় নিশিদিন জ্বলে মরচে। এখন মানুষ করে কি ? উদর পুরে খেলেও আবার ক্ষিদে পায়, যত সাবধানেই থাক না কেন কোথা থেকে দুবারোগ্য ব্যাধি এসে ধরে ; তার হাতও যদি এড়ান যায় ত—

কহে শুভ্রকেশ শিরে
এই ত ফুরাল দিন

—জরা আসে, গাছের পাতা রাঙ্গিয়ে যেমন শীত আসে, কালমেঘ সাদা করে' যেমন শরৎ আসে, তেমনি মাথার চিকুর শুভ্র করে' জরা হানা দেয় ; তারপর নদীর মোহানায় যেমন নীলাম্বুর জলোচ্ছ্বাস এসে নদী আর সমুদ্রের পার্থক্য মিলিয়ে দেয়—তেমনি জীবন মরণের মোহানায় মেশামিশি হ'য়ে সব একাকার হ'য়ে যায়। কিন্তু কালাপানির কিনারা পর্য্যন্ত প্রতিদিনের ক্ষিদে পিছু পিছু যায়—তার হাত একদণ্ডও এড়াবার যো নেই। অসহায় মানুষ করে কি ?

যেটা সইতেই হবে তার আর উপায় কি ? কিন্তু মানুষ উপায় খুঁজেচে—যুগে যুগে খুঁজেচে, দেশে দেশে খুঁজেচে—কেউ বলে পেয়েচে, কেউ বলে পায়নি।

সেকালের মুনি ঋষিরা পাকা হরিতকীর সন্ধান করেচেন, পাকা হরিতকী খেলে নাকি খাওয়ার দায় থেকে, ক্ষিদের জ্বালা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্ বনে, কে, করে, পাকা হরিতকী পাবে তার ত ঠিকানা নেই; সবারই ভাগ্যে মেলে কি না মেলে! তাই মানুষ মৃতসঞ্জীবনী সুধার (Elixir of Life) তল্লাস করেচে; কেউ বলে পেয়েচে কেউ বলে পায়নি—এ সন্দেহের জ্বালা ক্ষুধার জ্বালাকে বেশী করে' তীব্র করে' দিয়েচে মাত্র। কেউবা ফল বা জলের উপর নির্ভর না করে', নাক টিপে পাহাড়ের ধারে বসে' গেছে—পদ্মাসনে —জিহ্বা তালুসংলগ্ন করে',—ভ্রূমধ্যদৃষ্টি হ'য়ে—নিরুদ্ধ-শ্বাস হ'য়ে। উদ্দেশ্য, আর খেতে হবে না, আর ব্যাধির কবলে পড়তে হবে না, আর জরা এসে কেশ ধরে' টানবে না—মহিষপৃষ্ঠে ধর্ম্মরাজ এসে অবশ্যদেয়-কর আদায় করবেন না। কিন্তু কিছুতে কিছু হয়নি বলেই আমার ধারণা।

পাকা হরিতকী কার মিলেচে জানি না, মৃতসঞ্জীবনী কোন্ বৈজ্ঞানিকের ভাঁটিখানায় চোলাই হয়েচে বা হবে কে জানে, নাক টিপে কে সপ্তচিরজীবীর ন্যায় যুগে যুগে বেঁচে থাকবে তা জানি না; কিন্তু যদি থাকে তা হ'লে তারা কৃপার পাত্র তার ভুল নেই। নব নব রূপ রস গন্ধের, নব নব মন-প্রাণের সুরভিত ভাবতরঙ্গের, পতন ও উত্থানের, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্মের পর্য্যায়ের ভিতর দিয়ে চির পরিবর্ত্তনশীল জগতের panorama উদ্ঘাটিত হ'য়ে যাবে -- অমর মানুষ সে রসের গন্ধের রূপের ভাবের সুরের সঙ্গে আপনার অমর অজর, সুতরাং অচল অচঞ্চল জড় জীবনের তন্ত্রীগুলিকে এক সুরে বাঁধতে পারবে না--তার অমরত্ব মরণহীন বিষাদ ও বিজনতার চাপে দুর্ব্বিষহ হ'য়ে উঠবে—তখন তাকে বলতে হবে—কেড়ে নাও আমার অমরতা, আমাকে মরতে দাও, বাঁচতে

সে প্রবণতা প্রকট হ'য়ে উঠবেই উঠবে ; পৈতৃক মন ও পৈতৃক দেহের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে এমন স্মৃতিশাস্ত্রের পাঁতিও কেহ দিতে পারে না।

কমলাকান্তের যদি বংশ থাকত, তা হ'লে তার বংশধর যে কমলাকান্তের শূন্য অহিফেনের আধারের সঙ্গে তার আধিব্যাধিপূর্ণ শোণিত নিয়ে পৈতৃক আধিব্যাধিরও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হ'ত তার কোন সংশয়ই নাই। অর্থাৎ তার বংশাবতংস অহিফেন সেবন করত, কাজের মত কাজে সম্পূর্ণ অনাস্থাবান হ'ত, একটা প্রসন্ন খুঁজে নিয়ে, তার অন্ধ বিশ্বাসের সহায়তায়, তারই স্কন্ধে ভর করত, তার কোন ভুলই নেই। তবে দপ্তর লিখত কি না সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকত। কেহ কেহ বলেন দপ্তর লেখাটা অহিফেন সেবনেরই sequelae অথবা উপসর্গ, ওটা নিষ্কর্ম্মারই কর্ম্ম, সুতরাং কমলাকান্ত-বংশধরও দপ্তরের বোঝা বাড়িয়ে যেত।

আমি কিন্তু অন্য রকম ভাবি ; দপ্তরটা আমার প্রাণ, আমার সত্তা, প্রাণটা উত্তরাধিকার সূত্রে নেমে আসে না—নেপোলিয়ানের পুত্র নেপোলিয়ান হয়নি, বিদ্যাসাগরের পুত্র, বিদ্যাসাগর ছেড়ে, বিদ্যার খালবিল পর্য্যন্ত হয়নি। প্রাণের উত্তরাধিকার দেহ অবলম্বন করে' নামে না ; দপ্তরে অধিকার একমাত্র আমারই, জন্ম জন্ম আমারই থাকবে, তবে কোন্ জন্মে কোথায় যাব তার সন্ধান জানি না।

মোট কথা, পিণ্ডদান করে' পুত্র পিতার ধন হরণ করে, পিতার শোণিতের সঙ্গে তার ব্যাধি আ-হরণ করে, কিন্তু কোনদিনই তার প্রাণ, তার সত্তার বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় না। বাপের মত ছেলে হওয়া প্রকৃতির অভিপ্রেত নয় ; যদি হ'ত তা হ'লে আদম ও হবা, মানুষের আদি

সূত্রে আবদ্ধ। অহিফেন-সেবনের অবশ্যম্ভাবী ফলই অধীনতা, এবং অধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল অহিফেন-সেবন। সে কথার মীমাংসা আমি করব না,. কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করবে যে, যখন চতুর্দ্দশ অশ্বারোহী নদীয়ার সিংহদ্বারে হানা দিল, তখন অহিফেন-সরবরাহ-কারীরা লক্ষ্মণসেনকে অহিফেন-সেবনের সৌকর্য্যার্থে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে, সমরক্ষেত্রে না পাঠিয়ে, শ্রীক্ষেত্রে প্রেরণ করেছিলেন ; এবং যখন পলাশীর আম্রকাননে যুদ্ধ বাধে তখন অহিফেন-সেবাব্রত দেশের লোক, আমার মত বুঁদ হ'য়ে বসে' রইল—এবং যখন সমগ্র দেশটা হস্তান্তরিত হ'য়ে গেল, তখন প্রসন্ন গরুটাকে এ-গোজ থেকে ও গোঁজে বাধলে যেমন তার কোন বিকারই লক্ষিত হয় না—তেমনি দেশের কোন লোকের কোন বিকারই লক্ষিত হ'ল না। বরং কতকগুলা লোক নূতন গোহালে এসে নূতন জাবনার লোভে ডাবায় মুখ ডুবিয়ে দিলে।

যারা সেকালে টাকায় দু' মণ চাল পাওয়া যেত বলে' বড়াই করেন, তাঁরা বুঝে দেখবেন যে সে দু' মণ চাল খেয়েও দুকড়ার শক্তি বা বুদ্ধি সঞ্চয় হয়নি ; যাঁরা "আহা সেদিন কি চমৎকারই ছিল" বলে' সে কালের বিরহে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসান, তাঁরা যদি সেকালটির তারিখ নির্ণয় করে' বলেন ত বেশ দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, সেকাল যেকালই হ'ক তার জন্য রোদন করবার কোন কারণই নেই ; তার প্রধান হেতু এই যে "সেকাল"ই একালের পরাধীনতার জন্মদাতা ; আমরা যে আজ দাসের জাতি তা আমাদের পিতৃপুরুষগণ দাস ছিলেন বলেই—আমাদের দাসত্ব পৈতৃক। "সেকালে"র অপূর্ব্ব অবদান অহিফেন ও অধীনতা, উভয়ই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।

১৩ই বৈশাখ, ১৩৩৩

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্

এক যে ছিল রাজা। রাজা সভাপণ্ডিতকে বল্লেন—পণ্ডিতজী, এমন কোন বাক্য আছে যা সুখে দুঃখে, রোগে অরোগে, মানে অপমানে, সর্ব্ব অবস্থায় সুপ্রযুক্ত হয়?

পণ্ডিতজী বল্লেন—রাজন্, সে বাক্য এই "য়্যাসা দিন নেহি রহেগা"। দুঃখীকে বলুন, সে বুকে বল পাবে; সুখীকে বলুন, সে সুখের মোহে আত্মহারা হবে না; রোগীকে বলুন, আশায় তার বুক ভরে' উঠবে; অরোগীকে বলুন, সে সাবধান হবে; মান-গর্ব্বিতকে বলুন, তার চোখ ফুটবে; অপমানিতকে বলুন, তার বিক্ষুব্ধ বক্ষে পদ্মহস্ত বুলানর কাজ হবে।

রাজা খুব মোটা রকম পারিতোষিকের হুকুম দিলেন।

পণ্ডিতজী সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় প্রযুজ্য আর একটা কথা বলতে পারতেন—সেটা এই "কালে কালে কতই হবে!" আফিমের ভরি দু' সিকে থেকে দশ সিকে হয়েছে—কালে কালে কতই হবে। মেয়েমানুষে বাইসিকেল্ চড়চে—কালে কালে কতই হবে! ছেলেরা উড়ানি ছেড়ে দিয়েছে—কালে কালে কতই হবে! ব্রাহ্মণ রাঁধুনি হয়েচে, আর শূদ্র বেদাধ্যয়ন করচে—কালে কালে কতই হবে! এক দিনের পথ এক ঘণ্টায় যাওয়া যাচ্চে—কালে কালে কতই হবে!

নৃত্যশীল পুরুষ ও স্ত্রী থেকে বোধিদ্রুম তলে ধ্যানী বুদ্ধ পর্য্যন্ত—ভাইবোনের পরস্পর স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ থেকে আরম্ভ করে' পুরুষ এবং নারীর বহুবিবাহ, পরে সগোত্র consanguinity বর্জ্জন করে' একনিষ্ঠ স্বামী স্ত্রী পর্য্যন্ত —কাঁচামাংস ভক্ষণ থেকে সাত্ত্বিক আহার পর্য্যন্ত—নানা ছবি আঁকা যায় এবং প্রত্যেক ছবির নীচে লেখা চলে—কালে কালে কতই হবে!

কাহাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে না বোধ হয়, যে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নরনারী ও-কথাটাকে পরবর্ত্তী যুগের নরনারীর প্রতি বিদ্রূপ করেই বলবেন, এবং এই রকম ধাপে ধাপে চলে' যাবে। আর পরবর্ত্তী যুগের মানুষ—আপনাদের উন্নত অবস্থার গর্ব্ব করেই বলবেন—কালে কালে কতই হবে!

মোটের মাথায় বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে সমগ্র পৃথিবীতে সত্যযুগকে যদি জ্ঞানের যুগ ও প্রকৃত পবিত্রতার যুগ বলে' ধরা যায়, তা হ'লে সেটা অতীতে অবস্থিত না হ'য়ে কোন অনাগত কালের কোলে অবস্থিত বলেই ধরতে হবে; এবং সে সুবর্ণ যুগকে কল্পনা করে' বর্ত্তমানের সকল ত্রুটী সত্ত্বেও, এই আশায় বুক বাঁধা চলবে যে "য়্যাসা দিন নেহি রহেগা"—ইহার অপেক্ষা উজ্জ্বলতর, পুণ্যতর যুগ আসবে।

অতীত ও বর্ত্তমানকে ঠিক পাশাপাশি রেখে তুলনা করবার উপায় নেই। বৃদ্ধ যাঁরা তাঁরা বলবেন—"আমরা সেকালও দেখলুম আর একালও দেখলুম, অতএব আমাদের কথা শোন—সেকাল আর একাল, স্বর্গ ও নরক।" আমি কিন্তু তাঁদের কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। তাঁরা সেকালটা দেখেচেন সত্য, কিন্তু একালটাকে বেশ দেখতে পাচ্ছেন না। "চাল্‌সে" বলে' একটা চোখের ব্যাধি আছে; তেমনি মনশ্চক্ষুরও "চাল্‌সে" আছে,

astigmatism আছে ; তা'তে স্পষ্ট দর্শন ও অবিকৃত দর্শনের বাধা হয়। তাঁরা যে চক্ষুতে সেকাল দেখেচেন সে চক্ষু, চল্লিশ পার হওয়ায়, তাঁদের নেই ; তাঁদের এখন অন্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায় একদেশদর্শিতা এসেচে, বর্ত্তমানকে তাঁরা খুব ঘোলাটে রকম দেখচেন। বর্ত্তমানের সঙ্গে তাঁদের প্রাণের সংযোগ নেই বলে' তাঁদের দেখার সম্পূর্ণতা হচ্চে না ; 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' একথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে যাকে দেখতে পাইনা সে না জানি কি রকম কিম্ভূত, এটাও খুব সত্য। বুদ্ধদেব এই দশা হয়েচে।

আমি ৪০ বৎসর পরে, আমার জন্মস্থান দেখতে গিয়েছিলাম ;—বানপ্রস্থের জন্মস্থান দেখার বিধি আছে ; আমি বহুদিন যাবৎ প্রসন্নর বাড়ী বানপ্রস্থ নিয়ে আছি। ৪০ বৎসর আগে আমার চোখ ছিল উজ্জ্বল, কল্পনা ছিল সজীব, আশা ছিল এক বুক, উদ্যম ছিল সীমাহীন, দেহ ছিল ক্ষুদ্র, জ্ঞান ছিল অল্প। আমি আমার ছোট হাত পা দিয়ে, আর উদ্দাম কল্পনা দিয়ে আমার জন্মস্থানের পরিমাপ করেছিলাম। সুতরাং দেখেছিলাম বাড়ীটা কত বড়, উঠানটা মাঠের মত বিস্তৃত ; উঠানে দাঁড়ালে ঘরের পোঁতা ছিল আমার এক বুক, ঘরের দরজা জানলা ছিল উঁচু—আমি পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েও নাগাল পেতাম না। আর সেই রঙ্গীন কল্পনায়—ছেলেবেলার সহচর সহচরীরা, তাদের সঙ্গে খেলাধুলা, তাদের সঙ্গে সন্ধিবিগ্রহ কত মধুর রঙ্গীন **Mosaic** রচনা করে' রেখেছিল। ৪০ বৎসর পরে যখন সেই শৈশবের ক্রীড়াভূমিতে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন কোথায় বা সে বিশাল প্রাঙ্গন, আর কোথায় বা সে উচ্চ ঘর বাড়ী ; তারা ক্ষুদ্র হ'য়ে, সঙ্কীর্ণ হ'য়ে, আমায় যেন চেপে মারবার মত চারিদিকে ঘিরে' দাঁড়াল। খেলার

সাথী যারা বেঁচেছিল—তাদের সে রঙ্গীন উজ্জ্বল লীলাময় চাঞ্চল্য নেই ; তারা সব স্থবির, অবনত, ভগ্ন—সেই ক্ষুদ্র বাড়ীখানা, সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষসম্বল অন্ধকারময় কক্ষ, সেই ক্ষুদ্র উঠানের মতই ভগ্ন, নিষ্প্রভ সংকীর্ণ হ'য়ে দেখা দিল। স্থধু একটা জিনিষ আমার ছেলেবেলাকার কল্পনাকে ছাড়িয়ে উঠে আমাকেই ক্ষুদ্র করে' দিলে—সেটা উঠানের প্রান্তস্থিত কাঁঠালগাছটি। আমি বড় হয়েছি, আমার হাত পা বড় হয়েছে, তাই যেটা মোটেই বাড়েনি, যা ছিল তাই আছে—তাকে ক্ষুদ্র দেখলাম ; আর যে আমার চেয়েও ত্বরিত বেগে বেড়ে উঠেচে—সেই প্রকৃতির জীবন্ত বৃক্ষটি—সেই স্থধু আমাকে ক্ষুদ্র করে' দিলে। এই রকম প্রাণময় বর্ত্তমান মৃতবৎ বৃদ্ধদের ক্ষুদ্র করে' দেয় ; এবং বৃদ্ধেরা শোধতোলা হিসাবে তাঁদের মৃত অতীতকে বড় করে' বর্ত্তমানকে ক্ষুদ্র করে' দেখেন।

আমার বিশ্বাস যদি আমাদের কালের বুড়ারা তাঁদের যৌবনের কল্পিত রাজ্যে ফিরে যেতে পারেন, তা হ'লে তাঁদের কল্পিত স্বর্ণপুরীকে নিষ্প্রভ মাটির ঢিবীর মত দেখবেন, কারণ মৌজের চোখে যেটা যতখানি রঙীন দেখায়, সাদা চোখে সেটা ঠিক সেই পরিমাণেই মলিন দেখাবে—আর কল্পনা ও মৌজ মোটের মাথায় একই পদার্থ।

তবে একটা কথা এই যে, যুগে যুগে সুখ-দুঃখের হিসাব-নিকাশ করে' কৈফিয়ৎ কাটলে, জমায়-খরচে মিলে যাবে। আমার এক ছেলেবেলাকার খেলুনী বলত (তার মা যখন তার মাথার একরাশ চুল নিয়ে বিন্যাস করতে বসতেন) যে, "বেটা ছেলে হওয়া ভাল, বেশ চুল বাঁধতে হয় না,"—(চুল বাঁধাটা যুবতীর পক্ষে এক, শিশুর পক্ষে আর-এক)—এবং পরক্ষণেই বলত—"নাঃ, বেটাছেলে হ'লে আবার

পাগল

একটা পাগলা একখানা টিকে ধরিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে গাঁয়ের ভিতর ঢুকলো ,—হুহু কচ্চে হাওয়া, ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে রৌদ্র, পাগলা গিয়ে শুকনো ঝন্‌ঝনে খড়ের চালে সেই টিকেখানা সংযুক্ত করে' দিলে ; ছোঁয়াচে রোগের মত টিকের আগুন খড়ে গিয়ে প্রবেশ করলে ;—প্রথমে ধূম, তারপর অগ্নি, তারপর হুতাশনের লেলিহান শিখা গগন ছেয়ে ফেল্লে—দেখতে দেখতে, একখানা, দুখানা, দশখানা খড়ের চাল ধরে' উঠল—সমগ্র গাঁখানা হাহাকার করে' উঠল—ছেলে মেয়ে, স্ত্রী পুরুষ, প্রাণ রাখবে কি ধন রাখবে বুঝে উঠতে না পেরে, ছুটাছুটি সার করলে ;—তাদের আর্ত্তনাদ অগ্নিশিখার সঙ্গে আকাশের দেবতার দিকে ছুটে চলল—আগুন থামলো না, ঘরের সঙ্গে তাদের কপাল পুড়ে ছাই হয়ে গেল !

তখন তারা দেখে—পাগলা সেই জ্বলন্ত টিকেখানা হাতে করে' দাঁড়িয়ে হাসচে। সকলে বললে, পাগলা কি করলি ! কি সর্ব্বনাশ করলি ! প্রশ্ন করে' উত্তর নেবার যাদের অবকাশ বা ধৈর্য্য ছিল তারা শুনলে, হাহা করে' হেসে, পাগলা বলচে,—"বাবা, সুদের ঠেলায় এত, এই দেখ আসল আমার হাতে !"

তোমরা এই দুর্দ্দিনে সুধু সুদের বহর দেখে চমকে উঠচ ;—হেথায়

করে' বেড়ে উঠবে—তাদের শৈশবে আফিম ধরিয়ে হাড্ডিসার, খর্ব্বাকৃতি, রসহীন, বলহীন ব্রহ্মচারী করে' তোলা হচ্চে। তারা বড় হ'য়ে (যদি বড় হওয়া পর্য্যন্ত টিঁকে) আমার মতই লক্ষ্মীছাড়া হবে, তার কোন ভুলই নেই ; নয় ত কাঁচকলাভাতে ভাত খেয়ে শীঘ্রই দেবভোগ্য হ'য়ে উঠবে এটাও অবধারিত।

আমি বলছিলাম সাধারণতঃ একটু বয়স হ'লে আফিম ধরতে হয়! বয়স হ'লে মানে, ধর ৪০এর কোটা পার হ'লে—যখন হজমটা একটু কম হ'য়ে আসচে, গাটে একটু বাত আশ্রয় করচে. প্রস্রাবের পরিমাণ একটু বেড়েচে—সেই সময় আফিম ধরলে উপকার হয়, কবিরাজ মহাশয়েরা বলবেন। আর ঠিক সেই সময়েই তোমাদের আফিমটা সাধারণতঃ ধরবার নিয়ম। অর্থাৎ রক্তের জোরটা যখন কমে' এসেচে, নিজের হাত পা বুকের জোরটা যখন কমে' এসেচে, দুনিয়ায় ঘা খেয়ে খেয়ে যখন আপনার শক্তির উপর অনাস্থা এসে পড়েচে—ঠিক সেই সময় গুরুকরণ, গীতাপাঠ, সন্ধ্যা, আহ্নিক, গঙ্গাস্নানাদি আফিমের আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়ার আরম্ভ করতে হয়, এবং উঠতে, বসতে, হাই তুলতে, আফিমের স্রষ্টার (যার স্রষ্টা তুমি) নাম উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু জানবে এই সব লক্ষণাক্রান্ত যে ধর্ম্ম সেটাও একটা ব্যাধি, রক্ত কমজোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ব্যাধির মত এসে চেপে ধরে।

আমার আফিমের সঙ্গে তোমার আফিমের আর এক সাদৃশ্য এই যে, দুটারই **anodyne properties** আছে ; অর্থাৎ যন্ত্রণার মাত্রা হ্রাস করে। পেটের ব্যথায়, পেশীর ব্যথায়, আফিম খেলে বা আফিমের প্রলেপ দিলে ব্যথা কমে। তোমার আফিমেও মনের জ্বালা, সংসারের

ঝালাপালার হাত থেকে কখনো কখনো অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু তা বলে' আমার আফিম আর তোমার আফিম বিষ নয় এটা প্রমাণিত হয় না। ধর্ম্ম মানে অমৃত, আর আমার আফিমও অমৃত—আমরা উভয় আফিমখোরই "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—এই অমৃত মানে আভিধানিক বলেন বিষ এবং অমরত্বপ্রদায়িনী সুধা দুই-ই।

আমার অহিফেন আর তোমার অহিফেনের এই তৃতীয়বিধ সাদৃশ্য একবার প্রণিধান করে' দেখ। যদি অল্প মাত্রায় খাও, আমার আফিমে dyspepsia সারে, তোমার আফিমেও হয় ত মাত্রানুযায়ী সেবন করলে, রস পরিপাক হ'য়ে আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য প্রদান করে। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে উঠলে উভয়বিধ অহিফেনে বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে—মানুষটাকে মেরে ফেলে। আমার মত অহিফেনসেবী সকল কাজের বা'র; আর তোমার অহিফেনের উপাসকও সকল কাজের বা'র হ'য়ে যায়। তার প্রমাণ, আমার জীবনধারণের জন্য আমার হাত-পা কোন কাজে লাগে না—একটা প্রসন্নরূপিনী আশ্রয়দায়িনীর প্রয়োজন হয়; তোমার আফিমখেকোগুলোকে দশ জনে না পুষলে তাদের চলে না। তাই মঠ, মন্দির, আখড়া ইত্যাদির প্রয়োজন—এই আফিমখেকোদের পোষবার জন্য।

তোমাদের আফিম আর আমার আফিমে আর একটা সাদৃশ্য এই যে, কোন মৌতাতীকে যদি তোমার কোন প্রকার আধিব্যাধির কথা বল ত তিনি অমনি চিকিৎসকের আসনগ্রহণপূর্ব্বক বলবেন—একটু আফিম খাও। পেটের অসুখ?—একটু আফিম খাও। মাথাধরা?—একটু আফিম খাও। বহুমূত্র?—একটু আফিম খাও। নিদ্রা হয় না?—আফিম খাও। বড় গরম?—একটু আফিম খাও। বড়

এই—তোমার অহিফেন নিয়ে তুমি নিজের ঘরে, নিজের মণিকোটায় যা খুসী তা কর—তোমার আফিম সার্থক হ'ক—"অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী" পারে তোমাকে ব্রহ্মলোকে বা শিবলোকে বা গো-লোকে নিয়ে যা'ক ; অন্য কাহাকেও সঙ্গে নেবার ব্যস্ততা দেখিও না ; আর কেউ তোমার সঙ্গের সাথী হ'ল কি না তার জন্য ব্যস্ত হয়ো না ; যেহেতু তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমারই—আর কারও নয় ; একথা না বুঝলে গা জ্বলবে, মানুষ মরবে। বাহিরের সঙ্গে, গ্রামের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ তাই স্থাপন কর,—হিন্দুর সঙ্গে, মুসলমানের সঙ্গে, জৈনের সঙ্গে, শিখের সঙ্গে, সুধু মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন কর—এই ধর্ম্মই যুগধর্ম্ম, আর সব পাগলামি। তোমার আজকের এই পাগলামি দেখে যিনি আদিদেব পুরুষপ্রধান—তিনি হাসচেন, আর বলচেন, দেখ আমার পাগলেরা কি খেলা খেলে।

৩১এ বৈশাখ, ১৩৩৩

প্রত্যেকে এই সোঽহং মন্ত্র সাধনা কর, সেই সাধনার ফলে যে বহুর উদ্ভব হবে—সে বহুবচনে কাজ হবে। অতএব আমার উপদেশ অহংকে ঘুম না পাড়িয়ে—জাগাও, উদ্বুদ্ধ কর, কর্ম্মক্ষমতাকে ফোটাও, যা-কিছু করবার আছে সেটা একমাত্র তোমারই কাজ এই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হও—এই অহংকে পূর্ণতা প্রদান কর—মোক্ষলাভ হবে। চালাকির বহুবচনে, আর গৌরবের বহুবচনে কিছু হবে না। কেননা, হে শ্বেতকেতু, হে ভারতের তরুণ, নবীন, তুমি ভগবান কি না জানি না, কিন্তু তুমি ভগবানের প্রেরিত এ কথা মানি,—যে তাঁর বিশ্বরথ টেনে তার নির্দ্দিষ্ট পথে নিয়ে যাবে, সে তুমি ;—যে এই রথের অব্যর্থ অগ্রগতি সংরক্ষিত, পরিপুষ্ট, বর্দ্ধিত করবে, সে তুমি ;—যে সে পথের সকল বন্ধুরতা, সকল কণ্টক দূর করবে, সে তুমি। আমি স্থবির, আমাকে বহুর মধ্যে আত্মগোপন করতেই হবে, গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ঢেলে দিতেই হবে—কিন্তু তুমি নবীন, তুমি একবচনের সাধনা কর,—তুমি একাই করুণা, জ্ঞান, তেজ, ত্যাগের সাধনা করে' রাজার আসনে বস।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

কর্ত্তব্যের বোঝাটা বেশীর
াধে ততটা পড়ে না ; স্নেহ
ক, এমন কি কুসন্তান হলেও।
ভসন্ধি এই।
নহেন, আমার জননী নহেন ;
পূর্ব্ব জন্মে আর এই জন্মে তাঁকে
আবার গড়েচি—আমি তাঁর জনক,
তিপালক রক্ষক, আমি তাঁর সৃষ্টি-স্থিতি-

—দেশ আগে না মানুষ আগে ? সে পুরাতন
ন, হবে না—ডিম আগে কি মুরগী আগে ?
গে, না আম গাছ আগে ? তার মীমাংসা হবে
দি আমার দেশ বলতে সিন্ধুবারি-বিধৌত, তুষার-কিরীটী,
মুনা-প্লাবিত ভূখণ্ড মাত্র বুঝাত—তাকে আমরা সৃষ্টি করিনি
যুগে যুগে সে ভূখণ্ডটা একই ছিল, একই থাকবে—সিন্ধুজলের
লবণ কমবে না, তুষার গলে' শেষ হবে না, জাহ্নবী যমুনা শুকিয়ে যাবে
না ; তার জন্য আর ভাবনা কি ? তাকে মা বলাই বা কেন, বাবা
বলাই বা কেন ? মা-বাবা সম্বন্ধটা তখনই আসে যখন লালনপালনের
কথা আসে—ভাঙ্গাগড়ার কথা আসে—হ্রাসবৃদ্ধির কথা আসে—
উঠানামার কথা আসে—জন্মমৃত্যুর কথা আসে। এ সব কথাই
মানুষের সঙ্গেই আসে, আর মানুষের সঙ্গেই থাকে। সেই
মানুষ আমরা ; পাহাড়-পর্ব্বত, নদনদী, উর্ব্বরক্ষেত্র মরুভূমি, চিল্‌কা-
হ্রদ বা লবণসমুদ্র ছাড়া যে পদার্থগুলি—চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল, জ্ঞানময়,

জানিনা

ইচ্ছাময়, কর্ম্মময় যে মানুষ
আমরাই রক্ষক, এবং অ
প্রলয়কর্ত্তা—আমরা জনকজননী,
দেশটা মা নয় আমরাই তা
তপঃক্ষেত্রে বেদের উদ্ভব করেছি
জ্বেলে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচার করেছি
করেছি, আমরাই শঙ্করাচার্য্যের সব
করে' বুদ্ধত্বকে নিমজ্জিত করেছি ; আম
গড়েছি, শাস্ত্র লিখেছি, আবার তাকে
মুচেছি ; আমরাই মহম্মদ ঘোরিকে ডেকে
বসিয়েছি—এই যে বিপুল সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়—তার
হিমালয় নয়, বিকানীরের মরুভূমি নয়, পঞ্চনদ নয়,
সাগর-সঙ্গম নয়, বারাণসী নয়, সেতুবন্ধ নয়, পুরুষোত্তম নয়
মাতৃভূমি বোলো না, পিতৃভূমি বোলো না, তা'তে জনকের স্রষ্টার
কমে' যায়—সে দায়িত্ব কমানই যদি অভিসন্ধি হয় তা'তে আমার
বলবার নেই।

নিরাশায় যখন বুক ভাঙ্গে, নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলে যখন জর্জ্জরীভূত হই, তখন 'মা নিস্তারিণী' বলে' ডাকবার কেউ থাকলে একটু বল পাই, আশা পাই, কূলকিনারাহীন দুঃখ জলধির তরঙ্গে একটা আশ্রয় পাই—তাই হয়ত মা বলে' ডাকি, চীৎকার করি, রোদন করি—কিন্তু কোথায় মা? তোমার সহায়হীনা কন্যা, তোমার দুষ্কৃতির ফলভাগিনী হ'য়ে তোমারই মত রোদন কচ্চেন—শুনতে পাচ্চ না? অতএব দেশকে মা বলে' নিজের দায়িত্ব খাট কর' না, যেখানে অবলম্বন

হে মা
হে মা কালী কল্‌কত্তেওয়ালী, আমি
না মা! যুযুৎসু কুরুপাণ্ডবের মধ্যস্থলে দাঁ
বাক্যেন" মধ্যম পাণ্ডবের মোহ উৎপন্ন ক
তুমিও যুযুৎসবঃ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অবস্থিত হ
বুদ্ধিং মোহয়সীব মে"—আমি যে কিছুই বুঝে উঠ
হে মা কালীঘাটের কালী, হে মা ঠনঠনের কালী, হে
কালী, হে মা রাজসাহীর কালী—তোমার মন্দির ভেঙ্গে
বিগ্রহকে গাছে লট্‌কে দিয়ে ব্যভিচারী যদি নির্ব্বিবাদে ঘরে গিয়ে
তা হ'লে কবির কথায় যে বলতে ইচ্ছা করে—

"দেখ, দেখ, কি করে' দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ! মূঢ় নির্ব্বোধের মত!
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙ্গিছে আছাড়ি! হা হা হা হা!"

অত্যাচারী, অবিচারী যদি তোমার শ্রীঅঙ্গে আঘাত করেও
অনাহত গৃহে ফিরে যেতে পারে— তা হ'লে যে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে,

টিকুটি হচ্চে। মাতা যখন
চন, শিশু তাঁর চুলের মুটি দুই
ার তার দুরন্ত পা দুখানি মাতার
মাতা কোপের অভিনয় করে' নিজ
সন্তানের মুখ চুম্বন কচ্চেন। আমি
সন্তানের। এ থেকে কবি মা কালীকে
ব না, আর সন্তানকে ভৎর্সনা করলেও

অধিনায়ক তথাপি বলিলেন—"যে আমার হুকুম অমান্য করিবে তাহাকে কঠিন সাজা দিব।"

সিপাহিগণ—"আরে আমার সাজাদেনেওয়ালা! মারো শালাকো।"

যেমন কথা তেমনি কাজ—অধিনায়কের মৃতদেহ ধূলায় গড়াগড়ি গেল।

সিপাহিগণ অন্য আর একজন ব্যক্তিকে নায়ক মনোনীত করিল এবং প্রশ্ন করিল—"লুট, না লড়াই?" সে মৃতদেহের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—"লুট!"

হৈ হৈ শব্দে সিপাহিগণ দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করিতে ছুটিল।

এই তোমাদের তথাকথিত First War of Indian Independence, আর আমি বলি—The first organized plunder of the people, by the people, for the People (with a capital P). এই এক দিনের ঘটনা, সমগ্র বিদ্রোহের প্রতীকরূপে প্রমাণ করিয়া দিল যে, দেশবাসীর রক্তে অকারণ নদী বহাইয়া দেশোদ্ধার হইবার নহে। আরও প্রমাণ করিয়া দিল যে, Democracy মানে ভূতের নৃত্য—যদি প্রমথনাথের শিঙ্গা ভূতগুলিকে পরিচালিত বা প্রশমিত না করে।

Democracyর নামে অনেকে নৃত্য করিতেছেন—কিন্তু Democracy বলিতে কি বুঝায় তাহা এ পর্য্যন্ত বুঝা গেল না। Democracyর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া একজন খুব বড় Democratic দেশের পণ্ডিত কবুল করিয়াছেন—Like many unquestioned words it is not only vaguely sublime

but sublimely vague. যেমন তোমাদের "স্বরাজ"।

কেউ বলেচেন—Democracy means that any man could do as he liked if he called it freedom and equality.

কেউ বলেচেন—Democracy is want of Government which like equality offered great rewards to every unequal work.

কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ সংজ্ঞা তিনিই দিয়েচেন, যিনি বলেচেন—Democracy is that artful organization wherein nine fools have the privilege of shouting down one wise man.

এই মাথাগুন্তি করে', ভূয়সিকা (majority) দ্বারা সত্য আবিষ্কারের উপর আমার আস্থা নাই। জগতের ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে সত্য একজনেই আবিষ্কার করে' থাকে—সে আবিষ্কারক বেদব্যাসই হন বা বুদ্ধদেবই হন, নিউটনই হন বা গ্যালিলিওই হন, রুশোই হন বা লেনিনই হন, গান্ধিজীই হন বা দেশবন্ধুই হন। কমিটি করে' ভোট নিয়ে সত্য আবিষ্কার হয় না। একজন মহাপুরুষ বলেন—If Newton were to sit down in a Round-table conference with Liebnitz and Descartes, the law of gravitation would never have been discovered. একথা আমি মানি। গ্যালিলিও কমিটি করবার মত লোকই পেতেন কিনা সন্দেহ; যদিই বা পেতেন, সমগ্র খৃষ্টীয়-জগৎ খড়্গহস্ত হ'য়ে সে কমিটীকে unlawful assembly বলে' বরিশালী দাওয়াই দিয়ে দিত। Democratরা বলবেন—সত্য আবিষ্কার,

মন্ত্রদর্শন না হয় কমিটী করে' হয় না, কিন্তু কোন আবিষ্কৃত সত্যের প্রয়োগের বেলা, মন্ত্র-প্রয়োগের সময়, দশের মত না লইলে কি চলে? হয়ত চলে না। কিন্তু এ দশের মত মানে কি আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।

"ধামা" কথাটির প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় দুইটি শব্দে আছে—ধামা-চাপা এবং ধামা-ধরা। ধামা-চাপার ধামা অর্থে আমি বুঝি আবরণ অর্থাৎ ঢাকা। কোন অপ্রিয় বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখবার নাম "ধামা-চাপা" দেওয়া, ইংরাজীতে যাকে বলে—shelving. কমিটী, বা assembly, বা কমিশনের মত অপ্রিয় বিষয়কে চাপা দিবার সুব্যবস্থা আর কোথাও আছে কি না জানি না। ওয়ারেন হেষ্টিংসের অত্যাচার-কাহিনী প্রমাণিত হ'লেও Mother of Parliamentএ "ধামা-চাপা" দেওয়া হয়েছিল। Parliament গণতন্ত্রের রচিত একটা খুব শক্তিশালী যন্ত্রবিশেষ। হেষ্টিংসের ব্যাপারটা কোন জজের আদালতে পেশ হ'লে "ধামা-চাপা" দেওয়া তত সহজ হত না; কিন্তু গণতন্ত্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রবিশেষ জজ হ'য়ে বসায় "ধামা-চাপা" সহজে দেওয়া গেল।

কমিশন বসাইয়া উপস্থিত ভারতবর্ষের অশেষ কল্যাণের হেতু টাকায় ১৬ পেন্স Exchangeকে "ধামা-চাপা" দিয়া, টাকায় ১৮ পেন্স বাহাল করা হইয়াছে। কমিশন বসাইয়া কোন প্রস্তাব বিশেষকে "ধামা-চাপা" দিবার নিদর্শন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভূরি ভূরি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই সমস্ত নিদর্শন চোখের উপর বিদ্যমান থাকিতে Democracyকে ধামা-cracy বলিলে স্বরূপ বর্ণনাই করা হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস—দশের মত লইয়া চাপা দেওয়া হয় বলিয়া যে

C. R. Das নেতা; আর লুটের সিপাহীদলের নব-নির্ব্বাচিত নায়কটি নীত মাত্র। আজকাল পথে ঘাটে যে leader পালে পালে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই নীত মাত্র, নেতা নহেন। তাঁহাদিগকে যদি "ধামাধরা" বলা যায় এবং তাঁহাদের তাঁবে যে crowd আপনার গোঁ-ভরে সাতপুরুষের সঞ্চিত অন্ধকারের বোঝা বহিয়া গড্ডলিকা প্রবাহবৎ চলিয়াছে, তাহাদের সমষ্টিগত জীবনকে যদি "ধামা-cracy" বলা যায়—কিছুই অন্যায় হয় না বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই "ধামাধরা"-নেতাগণ-পরিচালিত Democracyর দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। Democracyর জননী বর্ত্তমান ফ্রান্স ও তাহার ছয় পয়সা মূল্যের ফ্রাঙ্ক তাহার নিদর্শন; আমাদের দেশের বিচ্ছিন্ন বিপর্য্যস্ত অবস্থাও আর একটি নিদর্শন।

কিন্তু প্রকৃত নেতা যিনি তিনি crowdএর আব্দার এক মুহূর্ত্তও সহ্য করেন না; crowdএর সযত্ন-সঞ্চিত অন্ধকারের পরিপুষ্টি সাধন লোক-ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন না; জনমতের নামে বাঁদরামি ও ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিতে হইবে এ কথা স্বীকারই করেন না; পরন্তু জনমতকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নিজমতে পরিণত করেন; তাঁহার নৈসর্গিক বৈদ্যুতিক শক্তি-সঞ্চালনে বিভিন্ন বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে এক অপূর্ব্ব সম্মিলনে মিলাইয়া দেন, যাহা কিছু আছে, আছে বলিয়াই, অনেকদিন আছে বলিয়াই, তাঁহার কাছে সম্মানের বস্তু নহে। যাহা আছে, তাহা কল্যাণের জন্য কি না, তাহাই তিনি দেখেন, এবং অব্যর্থ দৃষ্টিতে তাহার প্রকৃত রূপ দেখিতে পান; ধ্বংস যোগ্য বিবেচনা করিলে নির্ম্মম আঘাতে তাহার ধ্বংস সাধন করেন। তাঁহার কাছে—ক্রমে ক্রমে, শনৈঃ শনৈঃ, র'য়ে বসে'—এ সবই নিরর্থক

আমি প্রসন্নর সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিয়াছি—তাহারও ঐইমত! সে বলে—এক গোয়াল গরু, সবই গরু, আর দুটো করে' সিং আছে, এবং সবাই ঘাস খায়, আর ভাগাড়ে যায় বলে' কি সব গরু সমান, এবং সব গরু সমান মনে করে'—সকলের সমান কদর হবে? যে গরু যেমন দুধ দেয় তার তেমনি আদর, সে তেমনি ঘাস জল, খুদ ভুসী পাবে। তবে মুসলমানের সঙ্গে যুঝিবার সময় সবাই গোমাতা বটেন। কেননা আমার গোহালে অযত্নে না খেতে পেয়ে মরা এক, আর ছুরির আঘাতে মরা আর এক। আমাদেরও সেই দশা, ছত্রিশ জাতের খপ্পরে পড়ে হিন্দু হাবুডুবু খাক্ না, কিন্তু রাজার সভায় আমরা সব সমান। এটা খুব জবর অভিনয় বটে!

১০ই ভাদ্র, ১৩৩৩

তোমাদের চিরদিনের অভিযোগ, শাশ্বত অভিযোগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তোমরা স্বাধীন সৈরিন্ধ্রী নহ, তোমরা নির্য্যাতিতা, তোমরা প্রচুর শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা।

এ পোড়া দেশে শতকরা ছয়জন মাত্র শিক্ষিত অর্থাৎ লিখিতে-পড়িতে জানে—ইতিপূর্ব্বে, অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্ম ও সনাতন সমাজ-স্থিতির পূর্ণ প্রকোপের যুগে তাহাও ছিল না। এই ছয়জনের মধ্যে যদি পাঁচজন পুরুষ ও একজন নারীও হয়—তাহা হইলে বেশী উতলা হইবার কারণ এখনও সমুপস্থিত হয় নাই।

তারপর শিক্ষা লইয়া হইবে কি? যদি স্বতন্ত্র অর্থাৎ পুরুষের কবলের বাহিরে যাইবার পারদর্শিতালাভই তাহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে—হে নারী! মনেও করিও না যে সে শিক্ষালাভের সহায়তা কোন পুরুষ করিবে এবং করা উচিত। কারণ, একথা ভুলিলে চলিবে না, শতের মধ্যে একজন নারী সৈরিন্ধ্রী হইয়া কল্যাণময় জীবন যাপন করিতে পারেন বলিয়া আর ৯৯জনের মধ্যেও তাহা সম্ভব। যাহা সাধারণভাবে সম্ভব নহে, তাহা সাধারণের অবলম্বনীয় ব্যবস্থা হইতে পারে না—অর্থাৎ কোন সমাজের ধারা হইতে পারে না।

তারপর সৈরিন্ধ্রী হইলে নারীজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কি না তাহাও দ্রষ্টব্য। নারীজীবনের সার্থকতা পুরুষ-সম্পর্ক এবং সন্তানোৎপত্তি! একথা যে নারী ভুলিবেন তাঁহাকে কমলাকান্ত "বাবা মেয়ে" বলিয়া নমস্কার করে। "আঁটকুড়ী"র জীবন—কুমারীরই হউক আর পরিণীতারই হউক—যুগে যুগে, দেশে দেশে নারীহিসাবে ব্যর্থজীবন।

অত্যাচারিতের উপর কবির অভিসম্পাত সর্ব্ববিধ অত্যাচারের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য—প্রজার উপর রাজার অত্যাচার, নির্ধনের উপর ধনীর অত্যাচার, অজ্ঞানের উপর জ্ঞানীর অত্যাচার. দুর্ব্বলের উপর বলবানের অত্যাচার, নারীর উপর নারীর বা পুরুষের অত্যাচার। ভগবানের রোষ-বহ্নি জ্বালিবার অধিকার কিন্তু দুর্ব্বল মাত্রেরই আছে—সুতরাং নারীরও আছে; এবং অত্যাচারিত নারী সুধু কেরোসিনে নিজেকেই দগ্ধ করিয়া অত্যাচারের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে যথেষ্ট হইবে না। আমাদের দেশে শ্বাশুড়ী, ননদ, স্বামী যে বধূর উপর অত্যাচার করে, তাহার প্রধান কারণ সুধু অশিক্ষা বা কুশিক্ষা নহে; যেহেতু বর্ত্তমানকালে যাহাকে সুশিক্ষা বলা যায়, ভর্ত্তায় তাহা বিদ্যমান থাকিতেও বহুক্ষেত্রে অত্যাচারের কিছু অপ্রতুলতা হয় না; অতএব অশিক্ষা বা কুশিক্ষাকে দায়ী করিয়া সৎশিক্ষা দ্বারা সে অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে গেলে বধূকুল এখনও অনেক দিন মরিতে থাকিবেন।

"মায়ে পোয়ে" বধূর গণ্ডে খুন্তি পোড়াইয়া দেওয়া বা বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া মারার নিগূঢ় কারণ আমাদের দেশের সনাতন কালের প্রবচনে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—"ভাগ্যিবানের মাগ মরে, অভাগ্যিবানের ঘোড়া মরে"—যার ঘোড়া মরিল, সে অভাগা এই হেতু যে, পুনশ্চ অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে ঘোড়া কিনিতে হইবে। আর যার "মাগ" মরে সে এই হতভাগ্য দেশে ভাগ্যবান এই হেতু যে, তাহাকে পয়সা খরচ করিয়া ত পুনশ্চ "মাগ" কিনিতেই হইবে না, পরন্তু দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার যতবার খুসী অর্থসঞ্চয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে। ধোপার ঘরে আগুন লাগিলে, বা চুরী হইলে, মাড়োয়াড়ী

ক্ষুদ্র-বুদ্ধিরা গ্রহণ করে' থাকে, তাই আমি প্রসন্নর উপর রুষ্ট হলুম না ; কবি বলেচেন—

পাগলকে যে পাগল ভাবে
এখন সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল
একদিন সেটা বোঝা যাবে।

কিন্তু উপস্থিত, প্রসন্ন চটে উঠে যায় এই ভয়ে বল্লুম—"তা মুস্কিল, কিসের বল না, আমি আসান করে' দিচ্চি।"

প্রসন্ন। কাল সন্ধ্যার সময় একদল ছেলে "রক্ষে-কালী"র চাঁদা চাইতে এসেছিল, আমি বলেছিলুম আমার যা সাধ্য তাই দেবো। তারা যাই চলে' গেছে, আর একদল এসে বল্লে—'মাসি, চাঁদা যদি দেবে ত আমাদের হাতে দেবে, খবরদার ওদের হাতে দিও না।" আমি বল্লুম—"বাপ সকল, ওরা আর তোমরা কি তফাৎ? আমার ত সবাই সমান—তোমরা সবাই আমার সোনার চাঁদ—"

প্রসন্নর কথার বাঁধুনি শুনে বিস্মিত হলাম না ; কোন এক বিদুষী স্বজাতীয়া সম্বন্ধে বলেচেন—**"Woman is a born actress".** প্রসন্নর এই অভিনয়কুশলতা দেখে সেই বিদুষীর কথা মনে পড়ল ; কারণ আমি জানি প্রসন্নর স্বাভাবিক মূর্ত্তিটা অত নরম নয়—সেটা উগ্রচণ্ডীরই মূর্ত্তি। সে ইচ্ছা কল্লে বাছাদের অক্লেশে দুটা স্পষ্ট কথা বলে' খেদিয়ে দিতে পারত, তা দেয়নি। কেন দেয়নি তা'ও বুঝতে পারলুম—ঐ "রক্ষে কালী"র নামটার জন্য ; প্রসন্ন ঐখানটাতে একটু জখম।

কথার বাঁধুনির তারিফ করে' আমি বল্লুম,—"প্রসন্ন, তুমি নেতা হ'লে না কেন? জননায়ক হ'লে না কেন? বেশ ত কথার হার

গাঁথা শিখেচ ; উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, চতুর্দ্দিক বাঁচিয়ে কথা বলতে শিখেচ ; এ বিদ্যার পরিচয় তোমার ত পাইনি—

প্রসন্ন। শোন—শোন, এখনও আমার কথা শেষ হয়নি। এই খানেই শেষ হ'লে না হয় দু'দলকেই চুপি চুপি কিছু দিয়ে ঠাণ্ডা রাখতুম। দুইএর নম্বর ছেলের পাল আমার উঠান থেকে গেছে-কি-না-গেছে, আর এক দল এসে হাজির। তারা খুব তেরিয়া হ'য়ে বল্লে,—"দেখ, মাসি, 'রক্ষে কালী' নিয়ে উত্তরপাড়া আর দক্ষিণপাড়ায় দুটা দল হয়েচে। খবরদার, কাউকে চাঁদা দিও না—ও রক্ষেকালী ফক্কেকালীতে কিছু হবে না।" এখন কি করি—

আমি। দেখ, সব ছেলেদের শিবতলার উঠানে ডেকে এনে তোমার যা দেবার হরির লুটের মত ছড়িয়ে দাও, যে যা পারে কুড়িয়ে নিয়ে যাক, কোন গোল থাকবে না।

প্রসন্ন। তা'তে কি হবে জান, আমার টাকাও যাবে, আর কেউ সন্তুষ্টও হবে না ; সবাই চটে থাকবে, কোন্ দিন আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

আমি। আচ্ছা তবে এক কাজ কর—সবাইকে বল—"আমি কাউকে আগে টাকা দেবো না, তোমাদের কালীপূজা চুকে যাক, তারপর আমার যাকে যা দেবার দেবো।" যেহেতু 'রক্ষেকালী' পূজার পর আর কোন গণ্ডগোল থাকবে না ; সব এক হ'য়ে যাবে—এ কাজের দস্তুরই এই।

তখন প্রসন্ন আমাকে পেয়ে বসল ; বল্লে,—"যদি তাই হয় ত, তুমি গিয়ে তাদের বলে' এস না কেন!"

আমি। তা'ও কি হয়, অযাচিত উপদেশ দিতে নেই—আসুক

কর্ত্তা বল্লেন—"তা হ'লে কিন্তু কি ? করবে কি ?

তোমরা বল্লে – "তা হ'লে আমার ঘরে পর হয়েই থাকব।"

জবরদস্ত বল্লে - তোমার টাকার বাদ্যি সুমিষ্ট—Flood Relief-এর সময়, আর হুণ্ডি কাটবার সময় তা বুঝতে পারি ; কিন্তু তোমার ঢাকের বাদ্যি আমার কানে সহে না ; ঢাক থামাও আর টাকা দিতে থাক।

সাত্ত্বিক বল্লে -"যদি তাই করতে হয় তা হ'লে কিন্তু –"

জবরদস্ত বল্লে—"তা হ'লে কি ?"

সাত্ত্বিক বল্লে—"ঢাক বন্ধ, টাকা লও।"

আমরা জানি ব্যবসায় তোমার জান্, তোমার ধর্ম্ম, তোমার ইজ্জৎ ; আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান যদি স্বচ্ছন্দে না করতে পাই তা হ'লে—

মাড়বাড়ি বল্লে – আমরা কিন্তু—

ব্যবসাদার চক্ষু রক্তবর্ণ করে' বল্লে—"কি তা হ'লে ? করবে কি ?"

মাড়বাড়ী বল্লে—"তা হ'লে Lucky Dayতে যেমন indent দি তেমনি দিব !"

কন্যার বিবাহ হয় না—বরকর্ত্তা, বরগিন্নী, বরপুত্র, সবাই টাকা চায় ; বাপের চৌদ্দপুরুষে যত টাকা একত্রে দেখে নি, দেখবে না, তারও অধিক চায় ; কন্যার বিবাহ হয় না ; তুমি চীৎকার করতে থাক—"এ শোষণ নিবারণ কর, সমাজ গেল, জাত গেল।" এ অরণ্যে রোদন কে শোনে ? তখন জ্বালার চোটে তুমি বলে' উঠলে – "তা হ'লে কিন্তু—"

ত্রিমূর্ত্তি ছয়টা চক্ষু রাঙ্গিয়ে বল্লে—"তা হ'লে কিন্তু কি ? করবে কি ?"

তুমি উত্তর দিলে—"জাত বাঁচাব, চাঁদা করে' জাত রক্ষা করব, থিয়েটারে benefit night জোগাড় করেও জাত বাঁচাব—টাকা দেবো।"

*

সমাজের দশা হ'ল কি ?—বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তি রক্ষে, কিন্তু এ বুভুক্ষিত দেশে সে পিত্তি ত কারও পড়ে না ! কন্যাগুলা কি ভেসে এসেচে ? এ রকম কন্যার প্রতি অত্যাচার কি এই সনাতন ধর্ম্মের রাজ্য ছাড়া আর কোথাও হয় ? অসীম ধৈর্য্যের সহিত পরিণয়-সরিৎপারগমনেচ্ছু বুড়া হনুমানকে বুঝাও, বিবাহের পরিবর্ত্তে বৈতরণীর ব্যবস্থা করতে উপদেশ দাও, বুড়া বাঁদর নাচতে শিখে না তথাপি চেষ্টা কর—যদি এত শিক্ষা এবং উপদেশে না শিখে তা হ'লে –

বৃদ্ধ টাকার থলি দোলাইয়া, পুরোহিত রজঃস্বলা শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া, বলিল—"তা হ'লে কি ?"

তুমি অভাগিনীর জন্মদাতা বলিলে—"তা হ'লে—বিবাহ দিব আর কি ?"

*

ভণ্ডামিতে দেশ ছাইয়া গেল।

বঙ্গমাতার পিণ্ড চড়েচে

আলোচাল আর কাঁচকলাতে।

এই যে সনাতন ভিয়ান চড়েচে তা'তে বর্ত্তমান জীবনের খোরাক জুটবে না ; পরকালের ভোজ্য যে অমৃত তারই পূর্ব্ব সংস্করণ হ'তে পারে

আলোচাল আর কাঁচকলা—কিন্তু ইহজীবনের সহস্র জটিল জখমী কার্য্যে শক্তি দান করতে পারে এমন সারবস্তু তা'তে নেই। যদি থাকে, হে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ! শাস্ত্রবাক্যের এমন অর্থ কর যেন এই জীবন-যজ্ঞের সজীব মন্ত্র হ'য়ে আমাদের শক্তি দান করে, বিচক্ষণতা দান করে, বিক্রম দান করে! তা যদি না পার, তা হ'লে কিন্তু—

ভণ্ড শিখা হেলিয়ে বলে' উঠল—"কি তা হ'লে? করবে কি?

তুমি বল্লে—"তা হ'লে ষষ্ঠী, মাকাল ও ওলাইচণ্ডীর পূজা করব, আর তোমার পাদোদক পান করব।"

*

কাবুলিওয়ালা অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য উনানে পা দিয়ে দাঁড়ায়, তোমার দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার বন্ধ করে—প্রসন্ন বাকী টাকা আদায়ের অন্য উপায় না পেলে, খোকার দুধ বন্ধ করে' দেয়, আর তোমরা তোমাদের জীবনের শত শত অনাদায়ী দাবীর পূরণ প্রার্থনা করতে গিয়ে, হরিচরণের মত সুধু—"তা হ'লে কিন্তু—" বলেই থেমে যাও! তোমাদের সকল আন্দোলনের মধ্যে—রাজনৈতিক, সামাজিক, শৈক্ষিক, ধার্ম্মিক আন্দোলনের মধ্যে দেখি—ঐ এক স্থানেই এসে দাঁড়িয়ে পড়—তারপর চেপে ধরলেই যা করছিলে মুখটি বুজে তাই করতে থাক।

আমি জানি কেন? যা চাচ্চ তা না পেলে তুমি কি করবে তা জান না; অথবা মনে মনে জানলেও রক্তচক্ষুর সমক্ষে মুখ ফুটে বলতে পার না। কিন্তু মুখ ফোটো, নহিলে—বুক ফাটবে!

১৪ই আশ্বিন, ১৩৩৩

হইতেছে। হে মতিমান্, জাগো জাগো। কিন্তু মনে রাখিও তুমি মরিয়াছিলে, জাগিতেছ, কালনিদ্রার পর তোমার জীবনে নব সুপ্রভাতের ভৈরবী বাজিতেছে!

পণ্ডিত মহাশয়ের ঘড়ি বন্ধ; তথাপি তিনি বলিতেছেন—মরি নাই, বাঁচিয়া ছিলাম, বাঁচিয়া আছি, বাচিয়া থাকিব।

এ গর্ব্বের মূলে একটি সত্য আছে—কিছুই একেবারে মরে না, কীটপতঙ্গ হইতে কমলাকান্ত পর্য্যন্ত। জীবনের প্রবাহ চলিয়াই চলে, মৃত্যুর পর জন্ম, এ নাগরদোলা দুলিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর পর জন্ম হয় বলিয়া মৃত্যু মৃত্যু নহে, অথবা জন্ম মৃত্যু একই ঘটনা তাহা বলা চলে না।

বাঙ্গালায় যখন বক্তিয়ারের বাহিনী আসিয়া দেশকে গ্রাস করিল, হে বাঙ্গালি, তার পূর্ব্ব হইতেই তুমি মরণের পথে আগুয়ান হইয়াছ; ঐ নিদারুণ ঘটনার বহু পূর্ব্বে মৃত্যুর ছায়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তারপর সুদীর্ঘ অন্ধতমসা তোমার কুটীর-খানিকে ঘিরিয়াছিল—তখন তোমার সেই ভগ্নকুটীর বেড়িয়া বেড়িয়া সঙ্কীর্ত্তনের খোলই বাজুক, অথবা তোমার উঠানে হাড়িকাট ছাগরক্তে রঞ্জিতই হউক—তুমি কালনিদ্রায় বিভীষিকা দেখিতেছিলে। তোমার তেজ, তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তোমার স্বাচ্ছন্দ্য স্বাবলম্বন সবই অন্তর্হিত হইয়াছিল—তোমার জ্ঞানের পরিধি এই সুদীর্ঘ কালে এক-পর্ব্ব পরিমাণও বাড়ে নাই। তোমার ঐ দ্বিপ্রহরে যে ঘড়ি থামিয়াছিল তাহা থামিয়াই রহিল—সন্ধ্যা এল, ঘোর অমানিশায় ঘিরিল, ঘড়ি থামিয়াই রহিল। তুমি স্বগৃহ হইতে বঞ্চিত হইয়া, প্রসন্নর পবিত্র গো-গৃহে কমলাকান্তের মত, বেওয়ারিশ পরলোকে বাস বাঁধিবার

ফল হইয়াছে—পণ্ডিত মহাশয়ের সময়ের ধারণা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। তিনি চারি যুগ কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই চারি যুগের বিভাগ, আদি অন্ত মধ্য, বর্ষ মাস দিন, ঘটনার পূর্ব্বাপর, অগ্রপশ্চাৎ এ ধারণা লোপ পাইয়াছে; ঘড়ি থামিলে কি সময়ের খেয়াল থাকে? মৌজের মাথায় কমলাকান্তের মত—অন্ধ জাগো! না—কিবা রাত্রি কিবা দিন, এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয় মনে করেন যেন মনু যাজ্ঞবল্ক্যের পর, পরাশর অতি হারীতের পরই, হলায়ুধ এবং রঘুনন্দন ও তার অব্যবহিত পরেই তাঁহারা স্বয়ং। মনু হইতে টোলের স্মৃতিতীর্থের মধ্যে যে যুগ-যুগান্তর বহিয়া গিয়াছে—তাহার সংবাদ তাঁহারা রাখেন না। তাঁহারা মনু পড়িতে পড়িতে পরাশর পড়েন, তারপর একলম্ফে রঘুনন্দনে আসিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু সে যে কত বড় লম্ফ তাহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না। বায়ুপুত্র সাগরলঙ্ঘনে যে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন সে লম্ফ ইহার তুলনায় কিছুই নহে। অন্তরীক্ষচারী হনুমতের নিম্নে কয়েক যোজন মাত্র সমুদ্রজলরাশি বিস্তৃত ছিল, কিন্তু মনু হইতে স্মৃতিতীর্থ পর্য্যন্ত এক বিশাল কালসমুদ্র বিস্তৃত রহিয়াছে—সে সমুদ্রের তরঙ্গবিভঙ্গ পণ্ডিতগণের নয়নগোচরই হয় না।

বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ চৈতন্য যেন পাশাপাশি মিউজিয়মে সংগৃহীত প্রস্তরমূর্ত্তি সকল তাঁহাদের কল্পনার Curiosity shopএ সাজান আছে—তেমনি অচল ও জড়। শরতের নৈশ আকাশে কত গ্রহ-তারকা জ্বলিতেছে, যেন একখানি দিগন্তপ্রসারিত নীলাম্বরী শাটীতে সোনারূপার ফুল জ্বলিতেছে; কিন্তু ঐ গ্রহতারকার মধ্যে কত লক্ষ কোটি যোজন ব্যবধান শিশু কল্পনায় যেমন ধারণাই হয় না—

বলিলেন—"ম্লেচ্ছগণের কথা"। আমার মনে হইতে লাগিল চিনি-সন্দেশ দিয়া এ পণ্ডিত পোষণের আর কোন সার্থকতা নাই। চিনি-সন্দেশের বদলে এক এক গাছি দড়ি, শূন্য কলসী ত আছে এবং এই ভরা গাঙ্গে বৈতরণী পারের ব্যবস্থা করা উচিত।

পণ্ডিতগণকে বুঝিতে হইবে এই ম্লেচ্ছ কেমন করিয়া এই হিন্দুর ভারত অধিকার করিয়া বসিল। পণ্ডিত মহাশয়েরা ত সর্ব্বশাস্ত্রে সম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া বিরাজ করিতেছিলেন; তাঁহাদিগকে জানিতে হইবে কোন্ ছিদ্র দিয়া বিষধর এই লোহার বাসরঘরে প্রবেশ করিয়া লখিন্দরের পরমায়ু শেষ করিল। তারপর বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া বাঙ্গলা তথা ভারতের মসনদে বসিয়া ম্লেচ্ছ কি লইল, কি দিল। তবেই চৈতন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণবের মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত, রামপ্রসাদের অন্তরের উচ্ছ্বাস, আউলিয়া চাঁদের কীর্ত্তিগাথা ও কমলাকান্তের মর্ম্মবাণী বুঝিতে পারিবে।

এই প্রকার, চাতুর্ব্বর্ণ্যের লীলাভূমিতে কেন রাজপুত্র ভিখারী-বেশে অবতীর্ণ হইয়া জাতির বেড়া ভাঙ্গিয়া তেত্রিশকোটী দেবতার পূজা উঠাইয়া দিল; কোন্ মন্ত্রে সাগরমেখলা ভারতবর্ষব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল; আবার কোন্ অপরাধে সে সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল—বুদ্ধ ও শঙ্করের পূর্ব্বে মধ্যে ও পরে কি বিপর্য্যয় হইয়া গেল তাহার পরিচয় না পাইলে—বুদ্ধকেও বুঝা যাইবে না, শঙ্করকেও বুঝা যাইবে না।

কারণ একথা ভুলিলে চলিবে কেন যে, মাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মানুশীলনই যদি পুরুষার্থ হয়, জাতীয় জীবনই সে ধর্ম্মের উৎস, —পুস্তক নহে, পুঁথি নহে, টীকা নহে, ভাষ্য নহে। এই জীবনের

বালক। বাবুজি, যেদিকে তাকাই সেই দিকেই উঁচু দেওয়াল —আমার চোখ যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে—দূর দেখতে পাই না।

নসীবাবু। সে কি রে? পাগল হলি না কি?

নসীবাবু বালকের দুঃখ বুঝলেন না,—আমি বুঝলাম। সে হিমালয়ের শিখরে দাঁড়িয়ে দেখত—উপরে আকাশ এবং হিমগিরির চূড়ার পর চূড়া, নীচে শিখরের পর শিখর, উপত্যকার পর উপত্যকা—সুগভীর সমুদ্রের তরঙ্গ-বিভঙ্গের ন্যায় বিশাল বিপুল বিস্তার দিগন্ত পর্য্যন্ত চলে' গিয়েছে। নয়ন কোনদিকেই প্রতিহত হয় না। নীল আকাশের শুভ্র মেঘ, ভেসে ভেসে সেই দিগন্তে গিয়ে সংলগ্ন হয়। ঝর্ণার কুলু কুলু স্রোত অবিরাম ব'য়ে, উপত্যকার পর উপত্যকা অতিক্রম করে', প্রথমে শীর্ণ, ক্রমে স্ফীত, স্ফীততর রজত-ধারায় ঐ দিগন্তে মেঘের সঙ্গে মিশে যায়। বালক সেই সীমাহীন বিশালতা দেখে দেখে বিমোহিত, মুগ্ধ হ'য়ে যেত—তারই বিরহ আজ তাকে বেদনা দিচ্চে—সে দূর দেখতে পাচ্চে না, তার প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠচে।

আবার এমন লোকও আছে, যাকে কারাগৃহের মত ঘন-সন্নিবিষ্ট প্রাচীর, পথের ধূলা, অবিরাম ঘর্ঘর কল-কোলাহল মোহিত করে,—এবং ফাঁকায় দাঁড়িয়ে যার প্রাণটাও ফাঁকা হ'য়ে যায়।

কিন্তু এই দূর দেখাই মানুষের স্বভাব,—দূর দেখাই মানুষের প্রকৃতি। চোখের দৃষ্টি প্রতিহত হ'লেও কল্পনার ত বাঁধ নাই—যেখানে চোখ হার মানে, ঠিক সেইখান থেকে কল্পনা বল্গাহীন অশ্বের মত ছুটতে আরম্ভ করে।

মানুষ আজকের শত কার্য্য-জালের বেড়া থেকে যেমন এক

মুহূর্ত্তের ছুটি পায়, অমনি কালকের কথা ভাবতে থাকে—এই থেকে সঞ্চয়, এই থেকে জীবনের ধারা নির্ণয়, এই থেকে অনাগতের জন্য আয়োজন আপনি আসে। যদি বর্ত্তমানই—অর্থাৎ যেটাকে দেখা যাচ্চে, যা করা যাচ্চে, যা উপভোগ করা যাচ্চে, যা সহ্য যাচ্চে—সেইটাই শেষ হ'ত, তা হ'লে কালকের জন্য কেউ প্রস্তুত হ'ত না—কল্পনা, আশা বলে' কোন কিছু মানুষকে প্রলোভিত, আকৃষ্ট, বদ্ধ করত না। আবার এইখানেই শেষ নহে—মানুষ জীবনের ব্যবস্থা করে' আবার জীবন-জলধির পরপারের কল্পনাও করে, তার জন্য প্রস্তুতও হয়। অতএব দূর দেখাই মানুষের স্বভাব। যেখানে দূর দেখার ব্যাঘাত,—নিশ্চিন্ত হ'য়ে চিন্তা করবার অবসর পেলেই মানুষ সেইখানে চিন্তাকুল। দূর-ভবিষ্যতের কথা পরে, নিকট-ভবিষ্যৎও না দেখতে পেলে চোখে অন্ধকার দেখে, আর তার অন্তর হতাশ হ'য়ে বলে—দূর নেহি দেখ্‌তা!

আমরা সকলেই দূর দেখতে পাচ্চি না; দেখতে পাচ্চি না,—চোখের সন্নিকটে যে বিরাট প্রাচীর আমাদের দৃষ্টিকে প্রতিহত কচ্চে, তাকে ভেদ করে'—দূরে—ভবিষ্যতে—দিগন্তের কোলে কোলে আমাদের জন্য কিসেব পসরা নিয়ে দিক-বালিকাগণ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা কচ্চেন—সুখের না দুঃখের, মানের না অপমানের, জীবনের না মরণের—তা আমরা কিছু বুঝতে পাচ্চি না। অর্থাৎ আমাদের কল্পনা, আমাদের দৃষ্টি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আভাষ পর্য্যন্ত পাচ্চে না—আমরা বাঁচব কি মরব তার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পাচ্চে না।

যারা সেই কথা ভাবচে, তাদের হয় ত অনেকে বলচেন—

প্লাবন

কখনও বাদার আবাদের দিকে বেড়াতে গিয়েছ কি? যদি গিয়ে থাক ত একটা আশ্চয্য জিনিষ নিশ্চয়ই চোখে পড়ে থাকবে। গ্রামের পাশে পাশে বা মধ্যে মধ্যে এক একটা বৃহৎ ডোবা, প্রায় একটা কল্পিত রেখার উপর অবস্থিত, যেন একটা সুবৃহৎ ডোবার মালা মাটির উপর বিছান রয়েছে। কোন ডোবার নাম "ঘোষেদের গঙ্গা", কোনটার নাম "মিত্তিরদের গঙ্গা", কোনটার বা "দে'দের গঙ্গা", কোনটার "কুণ্ডুদের গঙ্গা"। তোমরা জান গঙ্গা এক ও অদ্বিতীয়—"মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে" বলে' যাঁকে স্মরণ কর, স্পর্শ কর, প্রণাম কর। যিনি –

নারদ কীর্ত্তন পুলকিত মাধব বিগলিত করুণা স্ফরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জ্জটি জটিল জটাপর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধার জ্যোতিঃ প্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরায় হিমাচল মূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে।

কিন্তু বাদায় এতগুলো গঙ্গা এলো কোথা থেকে! আর সে সব গঙ্গা ভিন্ন ভিন্ন মালিকের নামে নামাঙ্কিত হ'য়ে—"ঘোষের গঙ্গা", "বোসের গঙ্গা", "কুণ্ডুর গঙ্গা" হ'য়ে গেল কি করে'!

ভৌগলিক বলবেন—হয়ত কোন যুগে গঙ্গার স্রোত ঐ পথে

পারিবারিক আচারে পরিণত হ'য়ে, যেমন মনটাকে লোহার জুতা পরিয়ে ক্ষুদ্র খর্ব্ব বিকৃত করে' দেয়; রক্তের ধারার তেমনি স্বচ্ছন্দ প্রবাহ খণ্ডিত হ'য়ে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নরনারীর মধ্যে চক্রাকারে পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে, যুগযুগান্তর ধরে' নবশোণিতসম্পর্করহিত হ'য়ে—প্রদেশে, গোষ্ঠী মধ্যে, এমনকি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরিবার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে যায়, এবং পচে। রক্তের নৈকট্য ও অপরিশুদ্ধতা যে দেহের অবনতির কারণ সেই কারণের পূর্ণ প্রকোপ লোকচরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। আর্য্য-রক্তের অবাধ স্রোত এইরূপে ক্ষুদ্র জাতি উপজাতি প্র-জাতিরূপ ডোবায় পরিণত হ'য়ে পচ্চে,—দেহ-মন উভয়ই পচ্চে - ঘোষ-ক্ষত্রিয়ের ডোবা, চট্টোপাধ্যায়-ব্রাহ্মণের ডোবা, কুণ্ডু-বৈশ্যের ডোবা—সব পচে ভট্ ভট্ করচে—দেহ-মন উভয়ই পূতিগন্ধময় হ'য়ে উঠেচে। আর্য্যবংশধরগণের সংখ্যা কমচে—তার কারণ স্থধু দারিদ্র্য নয়—তার মুখ্য কারণ এই দেহ-মনের "ধসা পশ্চিমে" রোগ।

বাদার আবাদের যদি "ঘোষের গঙ্গা", "বোসের গঙ্গা", "কুণ্ডুর গঙ্গা"র পূতিগন্ধ দূর করতে হয়, পঙ্কোদ্ধার করতে হয়, তা হ'লে কি করতে হবে? অনেক "পুকুর-কাটা" উপদেশ দিয়েছেন—পাঁক তুলে' পাড়ের উপর গাদা কর, তারপর আকাশের জলে যখন পুকুর ভরে' উঠবে তখন ডোবার জল কাকের চক্ষুর মত স্বচ্ছ পরিষ্কার নয়নানন্দদায়ক হবে।

অনুরূপ বুদ্ধি প্রণোদিত হ'য়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতের ডোবার সংস্কার-কল্পে, জাতের পঙ্কোদ্ধার কর্ত্তে চারিদিকে সংস্কারকের দল কোদাল-ঝুড়ি নিয়ে লেগে গেছেন। তারই ফলে ব্রাহ্মণসভা, কায়স্থসভা,

বৈদ্য-ব্রাহ্মণসভা, বৈশ্যসভা, স্বর্ণবণিকসভা, তিলিসভা ইত্যাদি সভাসকল গজিয়ে উঠেচে। এই জাতির "পুকুর-কাটা"দের ধারণা জাতগুলার আভ্যন্তরীণ পঙ্ক উদ্ধার করে' পাড়ের উপর গাদা করলে, আকাশের জলে পুকুরে স্বচ্ছ জল থৈ থৈ করবে।

কিন্তু এই সংস্কারকের দল ভুলে' যান যে জাতির পাঁক তুলে' পাড়ে গাদা করলে, কালের স্রোতে সে পাঁক পুকুরেই ধুয়ে এসে পড়বে; তারপর পাড়টাকে আরও উঁচু করে' প্রাচীর দিলে, নব-জলধারার স্রোতটাকেই বাঁধ দিয়ে বাহিরে রাখা হবে, এবং বিভিন্ন ডোবাগুলিকে অর্থাৎ ছত্রিশ জাতকে আরও স্পষ্ট ও কায়েমী করেই রাখা হবে। এবং আকাশের জলে ক্ষণকালের জন্য ডোবার মলিনতা অপনোদন হ'লেও গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে আবার জল শুকিয়ে যাবে, আবার পচ ধরবে; কেননা পচধরা রোগ পুকুরের ভিতরেই বর্ত্তমান—তার সঙ্কীর্ণতা, তার বদ্ধতা, বিশ্বের ভাব-মন্দাকিনীর প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্নতাই ডোবার পচধরার কারণ।

কেউ কেউ বলেন—তবে ডোবার পাড় ভেঙ্গে চতুঃপার্শ্বস্থ জমির সঙ্গে সমতল করে' দাও; অর্থাৎ জাতের গণ্ডী তুলে' দাও, সব পুকুরগুলা একাকার হ'য়ে যাক। এ কার্য্য সম্প্রতি এক সমাজ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তা'তে কৃতকার্য্য হননি। ভেবে দেখুন যদি ঘোষের গঙ্গার, বোসের গঙ্গার, কুণ্ডুর গঙ্গার, পাড় ধসিয়ে দিয়ে এক করে' দেওয়া যায় তা হ'লে কি (জলস্রোতের কথা ছেড়ে দি) একটা লম্বা দীঘিকারও সৃষ্টি হ'তে পারে? ডোবার সম্বল জল, জাতির সম্বল জীবন, ক্ষুদ্র ডোবায় গণ্ডুষপরিমাণ জল যতক্ষণ পাড়ের মধ্যে আবদ্ধ আছে ত আছে, পাড় সমতল করে' দিলে, জল

মাঠে গিয়ে মাঠে মারা যাবে। জাতির সম্বল যেটুকু প্রাণ এখনও ধুক্ ধুক্ কচ্চে তাকে যদি গণ্ডীর ভেতর বদ্ধ না রেখে একাকার করে' দেওয়া হয়—যে ক্ষীণ প্রাণটা এখনও দেহে রয়েছে তা'ও চলে যাবে—জাতির বাঁধনহীন যে সংস্কারকের সমাজ—সে সমাজ যে একান্ত প্রাণহীন তার কারণই এই—আর সেটা আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্চি।

তবে উপায় কি? উপায়—যদি জাহ্নবীজলস্রোতের মত একটা জীবন্ত স্রোত এই পরিশুষ্ক পঙ্কিল পূতিগন্ধময় জাতির জীবনে প্রবাহিত করে' দেওয়া যায়, একটা ভারতবর্ষব্যাপী ভাবস্রোত—যার উৎস, আকাশের সবিরাম বৃষ্টিপাত নয়, যার উৎস বিশ্বের জ্ঞান-জলধি—সেই স্রোত কোন ভগীরথ এই জাতির খণ্ডিত জীবনে প্রবাহিত করে' দিতে পারেন, তবেই এই সহস্র ডোবার পঙ্কোদ্ধার হয়—সমগ্র জাতি নূতন ভাব-বন্যার সঙ্গে নবজীবন লাভ করে।

ভারতের বিচিত্র ইতিহাসে এ চেষ্টা হয়েছিল; যখন কপিলাবস্তুর রাজপুত্র ভারতের পঙ্কিল পল্ললে নূতন জীবন-জল-প্লাবন এনেছিলেন—ক্ষুদ্র ডোবাগুলোকে ভাসিয়ে ছয়লাব করে', ভারতের মহাস্থবির কলেবরে যৌবনজলতরঙ্গ বহিয়েছিলেন—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির পাড় প্লাবনের পীড়নে ধসে' পড়েছিল—জাতি ছিল না, ধর্ম্মের কোলাহল কচ্‌কচি ছিল না,—ছিল কর্ম্মের উদ্দাম স্রোত, সৃষ্টির দুর্ম্মদ আবেগ, গঠনের অলৌকিক প্রেরণা;—কে সে প্লাবন আনবে?

১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৪

is blind—এ বাক্যটার সাধারণ অর্থ প্রেমিক প্রেমিকা উভয়েই উভয়ের দোষ দেখতে পায় না, কেবল গুণই দেখে, আর ভালবেসে চরিতার্থ হয়। কিন্তু প্রকৃত কথা ভালবাসায় অন্ধ করে না—অন্ধ হ'য়ে তারপর মানুষ ভালবাসে। চোখ ফুটলে ভালবাসার নিবিড়তা কমে' আসে—Familiarity breeds contempt, ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশির পর যখন দেহ-মনের দোষগুলা চোখের বালি হ'য়ে চোখে পড়ে—তখন চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে—সেটা ঠিক আনন্দাশ্রু নয়, প্রেমবারিও নয়।

পুঁয়ে পাওয়া ছেলেকে মা বুকে করে' রাখে, তার কদর্য্য চেহারা মাতার চোখে পীড়া উৎপন্ন করে না—মাতৃহৃদয় ছেলের কুক্কুরবৎ বিশীর্ণ মুখে কত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করে—রাজপুত্রেও সে সৌন্দর্য্য দুর্লভ! এখানে আর এক দিক দিয়ে Love is blind, অর্থাৎ মাতা অন্যের ছেলের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও অন্ধ—নিজের ছেলেটীর মত ছেলে দুনিয়ায় তিনি দেখতে পান না। এত বড় illusion বা মায়া হয়ত সৃষ্টিরক্ষার জন্য প্রয়োজন, মাতার এই একান্ত একনিষ্ঠ ভালবাসা না থাকলে হয়ত সৃষ্টি থাকে না—তা হ'লেও এটা যে একটা illusionএর চরম illusion তা বলতেই হবে।

কবির কল্পনা in fine frenzy rolling, স্বর্গমর্ত্ত্য এক করে' ফেলে—মর্ত্ত্যকে স্বর্গ দেখে, স্বর্গকে মর্ত্ত্য দেখে, কোন প্রভেদ দেখতে পায় না ;—frenzy কথাটার উপর একটু ঝোঁক (emphasis) দিলে আমার বক্তব্যের সঙ্গে বেশী প্রভেদ থাকে না। আমিও মৌতাতের ঝোঁকে অনেক খেয়াল দেখে থাকি, সে খেয়ালকে কেউ দিব্যদৃষ্টি বলে' গ্রহণ করতে রাজি নয়। খেয়ালের মাথায় আমি দেখি—পুরুষ

প্রসন্ন

হে বিচারক! তুমি প্রসন্নকে অপরাধীর কাঠগড়ায় পুরে' তার বিচার করতে বস না, তোমার ধর্ম্মের দোহাই! Judge not that ye be not judged—তোমারই ধর্ম্ম বলে। বিচারকের আসন বড় উচ্চ আসন, তোমার শক্তি, তোমার ঐশ্বর্য্য তোমাকে সে আসনের অধিকার প্রদান করে না।

সে অধিকার লাভ করতে গেলে, যে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন, অত শক্তি, অত ঐশ্বর্য্য সে নিরপেক্ষতার পরিপন্থী। শক্তিধর নিজের দিকটাই দেখে; প্রসন্নর দিক বলে' একটা দিক আছে, তার সম্যক ধারণা করবার মত স্থির চিত্ত বলদৃপ্তের থাকতে পারে না, তুমি বলদৃপ্ত অন্ধ; অতএব বিচারকের আসন কলুষিত ক'র না।

সুবিচার করতে গেলে মূলে যে idealএর তফাৎ রয়েচে, সেটা সম্যক মাথায় ধরে' রাখতে হয়। হে বিচারক, এই idealএর বিভিন্নতা সম্বন্ধে কোন খেয়ালই তোমার মনে উঠে নাই; অতএব idealএর মুক্তা তোমার সমক্ষে না ছড়িয়ে—তুমি যে detailএর উপর তর্ক চালিয়েছ আমিও সেই পথে চলিলাম।

তুমি জান কি প্রসন্ন বিধবা—সাদা থান পরে, এক সন্ধ্যা খায়, বারব্রত নিয়ে জীবনযাপন করে? সে widow's weeds পরে' বাহার

বন্ধন হ'লেও তাকে সানন্দে বরণ করে' নিয়েছিল ; অতএব শিহরিও না।

তারও পূর্ব্বে, সে যখন কুমারী (তখন সে শিশু বল্লেই হয়) তখন থেকেই সে মাতা হবার কল্পনা করেচে। তার শিবপূজার ভিতর, তার খেলাঘরের ভিতর, তার ভাবী পুত্রকন্যা ইচ্ছারূপে, আকাঙ্ক্ষারূপে বর্ত্তমান ছিল। কুমারী ও বধূর মধ্যবর্ত্তী এমন একটা অদ্ভুত অবস্থা তার কখনও ছিল না, যখন সে স্বৈরিণী ; যখন তার পিতামাতা পর্য্যন্ত স্বীকার করে' নিয়েছিল যে সে স্বৈরিণী, যে হেতু সে বিবাহ করে' পণবদ্ধ নয়। এই কৌমার্য্যের বন্ধনহীনতায় সে প্রমথনাথের পূজা করেচে, কিন্তু প্রমথগণের সহিত স্বৈর-বিবাহ করেনি ; অতএব শিহরিও না !

হে বিচারপতি, তুমি বিচার করবার অধিকারী নও, যেহেতু তুমি প্রসন্নকে বুঝতে পারবে না, প্রসন্নর দিক থেকে দেখতেই পারবে না।

প্রসন্নকে যদি গালি দিতে হয়, আমি দিব, কেননা আমি প্রসন্নকে জানি, ভালবাসি। ভালবাসার অধিকার যার নাই, তার তিরস্কারের অধিকারও নাই। মাতা সন্তানকে তাড়না করেন, সে তাঁর স্নেহের দাবী ; পথের লোকের সে দাবী নাই। তুমি পথের লোক, হে বিচারক, তোমার বিচারকের নিরপেক্ষ দর্শন নাই, ভালবাসার দাবীর কথা ত বহুদূরে।

প্রসন্নকে ঘৃণা কর আমি সহিব—

Patient as sheep we yield us
Unto your cruel hate

কেননা তুমি প্রসন্নকে ভালবাসিলে আমি ভীত হইতাম—বুঝিতাম প্রসন্ন উচ্ছন্ন গিয়াছে। কেননা তুমি ত সহজে ভালবাসিবার পাত্র

কার্য্য এত অনাড়ম্বর ও অমোঘ যে আমরা, অর্থাৎ পুরুষরা যে অবাধে তাদের অনুগমন করি তা আমরা টেরও পাই না।

প্রসন্ন যদি আমার স্ত্রী হ'ত লোকে আমাকে স্ত্রৈণ বলত; কিন্তু আমার একটা খটকা লাগে—আমি যদি নেতা হতাম এবং আমার স্ত্রী যদি কায়মনোবাক্যে আমার অনুসরণ করতেন, তা হ'লে তাঁকে লোকে পতিব্রতা বলে' ধন্য ধন্য করত, এবং সেই ধন্যবাদের ঠেলায় হয়ত তিনি আমার সঙ্গে সহমৃতা পর্য্যন্ত হ'তে উদ্যতা হতেন। আমি কিন্তু এটা ঠিক বুঝতে নারলাম—স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করলে পতিব্রতা হয়, আর পতি স্ত্রীর অনুগামী হ'লে পত্নীব্রত না হ'য়ে স্ত্রৈণ হয়। এ digressionএর হয়ত কোন মূল্যই নেই, একেবারে হাওয়ায় ফাঁদ পেতে তর্ক, কেননা আমি চিরকুমার, প্রসন্নর আশ্রয়ে বাস করি মাত্র।

যা হ'ক—সমাজে বা রাষ্ট্র মধ্যে যিনি নেতা তিনি কখনও একটা বিরাট ঝঞ্ঝার মত, সমুদ্রকে উদ্বেলিত করে', বনানীকে মথিত করে', পর্ব্বতচূড়াকে চূর্ণ করে', আপনার গন্তব্য পথে চলে' যান, আর তুমি আমি প্রসন্ন—সকলকে ঘাড় ধরে' আপনার প্রদর্শিত পন্থায় চালিয়ে নিয়ে যান। তিনি সূর্য্যের ন্যায় জগতের জীবনরূপী—মহাদ্যুতি, ধ্বান্তারি, সর্ব্বপাপঘ্ন,—অজ্ঞানতিমিরনাশী, সকল পাপের অর্থাৎ অন্যায়ের অন্তকারী।

কখনও বা তিনি উষার রাগে, কখনও প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণে, কখনও সন্ধ্যার ম্লান আভায় ধরার বক্ষ প্লাবিত করেন। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় তিনি স্বপ্রকাশ, স্বীয় বিজ্ঞান-বিভায় উদ্ভাসিত।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন এই জননায়ক কখন কখন রাহুগ্রস্ত হ'য়ে ক্ষণকালের

জন্য অন্ধকারের আবেষ্টনে মুহ্যমান হন—বুদ্ধ, চৈতন্য, মহম্মদ, যীশু—নেপোলিয়ন, লেনিন, সান ইয়াটসেন—সকলেরই এই দশা হয়েছিল—কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য মাত্র।

নীত যাঁরা তাঁদের জ্যোতি নেই, উত্তাপ নেই—জনসঙ্ঘের তাপ তাঁরা পরিমাপ করেন মাত্র। জনসঙ্ঘ তাতিয়া উঠিলে তাঁরা তাতিয়া উঠেন; তাঁরা যে উত্তাপ record করেন সেটা তাঁদের নিজের তাত নয়, অপরের। এই নীতের দল বানের মুখে নৌকার মত—স্ফীত তরঙ্গ শীর্ষে আরোহণ করে' ভেসে যান—দেখায় যেন তাঁরাই বানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্চেন—কিন্তু তাঁদের নাস্ত্যেব গতিরন্যথা—তাঁরা আগে যান বলে' অগ্রণী—এগিয়ে নিয়ে যান বলে' নয়।

নীতদের স্বপক্ষে একটি কথা বলবার আছে যে, জনসঙ্ঘের তাপটা তাঁরা অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করেন; তাঁদের নিজ সত্ত্বাকে জনসঙ্ঘের সত্ত্বার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন—জনমতটাকে সৃজন কর্ত্তে না পাল্লেও গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু অভি-নেতা—সে বড় বিষম জন্তু!

অভিনেতার সাধারণ প্রকৃতি যা তা পূর্ণ মাত্রায় তাঁদের মধ্যে বর্ত্তমান—অর্থাৎ যিনি ভীম সেজেচেন—তাঁর মধ্যে বৃকোদরের গর্জ্জন ও বপুর বিশালতা ব্যতীত আর কোন লক্ষণ না থাকলেও তিনি ভীমের অংশ অভিনয় করে' যেতে পারেন; ভীম-চরিত্রের সঙ্গে তাঁর এক-প্রাণতা না থাকলে কিছুই এসে যায় না। অভি-নেতাগণের সম্বন্ধে ঠিক সেই কথা বলা চলে—অভি-নেতাগণ প্রকৃত যে বস্তু সেটাকে পূর্ণ মাত্রায় ঢেকে রেখে, লোকের কাছে—অবস্থা বিশেষে যে রূপে প্রকট হ'লে ঠিক খাপ খায়, তাঁরা ঠিক সেই রূপে প্রকাশিত হন। তাঁরা যে রূপটা পরিগ্রহ করেন সেটা একান্ত নিজের জন্যই, পরের জন্য নহে। তাঁদের

বর্ত্তমান কালে শক্তিহীন দরিদ্র দরিদ্র-নারায়ণ নামে পূজিত হচ্চে ; এই পূজা প্রকরণের নাম দেওয়া হয়েচে democracy. ধনবানের আরাধনা যে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, দরিদ্র-নারায়ণের আরাধনাও সেই ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। নেতৃবর্গ অর্থাৎ অভি-নেতৃবর্গ বর্ত্তমান ভুলটাকে ভুল বলে' বুঝতে পেরেও জনমতকে ছাড়িয়ে উঠতে পারচেন না।

প্রথম ভুল—দরিদ্র দরিদ্র বলেই নারায়ণত্ব দাবী করতে পারে না—তার যা কিছু দাবী তা মানুষত্বের দাবী ; সে দাবী ধনীরও আছে—অতএব দরিদ্র-নারায়ণ না বলে' মনুষ্য-নারায়ণ কথাটাই সত্য—সবার উপর মানুষ সত্য—এ বড় সত্যকথা।

এত দিনের নিপীড়িত দরিদ্র যখন মাথা তুলে' দাঁড়াবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েচে তখন তাদের নারায়ণত্বে দাবী অমান্য করা অভি-নেতাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

অভি-নেতাগণ নারায়ণত্ব স্বীকার করার ফলে ধনীর সঙ্গে নির্ধনের বিরোধটা পাকা হ'য়ে যেতে বসেচে। কিন্তু অভি-নেতাগণকে চুপি চুপি ডেকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে দরিদ্রের মধ্যেও সত্যিকারের নারায়ণকে কতখানি দেখলেন—তা হ'লে চুপি চুপি তাঁরা স্বীকার করবেন যে, ধনীর মধ্যেও যতখানি দরিদ্রের মধ্যেও ততখানি অর্থাৎ একটুখানিও নয়। কিন্তু প্রকাশ্যে অর্থাৎ platform থেকে সে কথা বলবার তাঁদের সাহস নেই—এই সাহসের অভাবে তাঁরা আত্ম-প্রতারিত এবং অন্যকেও প্রতারণার মধ্যে ফেলে একটা বিরাট ভুলকে বাঁচিয়ে রেখেচেন।

ভগবান গড়লেন নর ও নারী। দুটা ভিন্নধর্ম্মী জীব—অভি-নেতা

বক্র রক্তমাখা ছুরিকার মত ক্রূর; চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্র কিন্তু সর্ব্বদর্শী।

ভোজ্য ও পানীয়ের প্রচুর সমাবেশ—চতুর্দ্দিকে আনন্দের কোলাহল; তৈমুর রাজন্যবর্গ পরিবৃত হইয়া আনন্দে মত্ত। তাঁহার পার্শ্বে অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্র কবি করমানি উপবিষ্ট। করমানি নির্ভীক স্পষ্টবাদী—মৃত্যু হইতে ভয়ঙ্কর তৈমুরের মুখের উপর অপ্রিয় সত্য বলিতেও কুণ্ঠিত নহে। তৈমুর জিজ্ঞাসিলেন—"কবি কত টাকা মূল্যে আমাকে বেচিতে পার?"

করমানি উত্তর করিলেন,—"পঁচিশ টাকায়।"

তৈমুর। পঁচিশ টাকা ত আমার জুতারই মূল্য।

কবি। আমি জুতার কথাই ভাবিতেছিলাম—সুধু জুতারই কথা—কারণ তোমার নিজের কোন মূল্য নাই—একটা কড়িও নয়।

ভীষণ হইতে ভীষণতর তৈমুরের মুখের উপর কবি এই সত্যকথা বলিলেন। কবি জয়যুক্ত হউন—কেননা কবিই একমাত্র সত্যের উপাসক—তাঁহার অন্য উপাস্য নাই এবং সত্য তৈমুরের তরবারি অপেক্ষা ভীষণ।

সুরা-স্রোত বহিয়া চলিয়াছে—সঙ্গীত-তরঙ্গ হিল্লোলিত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে—সেই উন্মত্ত আনন্দ-কলরব ভেদ করিয়া, বর্ষণোন্মুখ ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি বিদীর্ণ করিয়া যেমন বিদ্যুল্লতা ছুটিয়া যায়, কোথা হইতে নারীর আর্ত্ত-কণ্ঠরব ক্রূর তৈমুরের কর্ণ ব্যথিত করিল—সে কণ্ঠস্বর পুত্রহারা এবং পুত্রহন্তা তৈমুরের চিরপরিচিত।

তৈমুর হুকুম করিলেন—দেখ এ আনন্দের মধ্যে নিরানন্দ কে আনে—

প্রতিহারী সংবাদ দিল—ছিন্নবসনা, ধূলি-ধূসরিতা এক রমণী,

উন্মাদিনী-প্রায়, ত্রিভুবন-বিজয়ী সাহান-সাহের সহিত সাক্ষাৎ চাহে।

"লইয়া আইস"—তৈমুর হুকুম করিলেন।

পরমুহূর্ত্তে তাঁহার সমক্ষে ছিন্নবসন-পরিহিতা তাম্রবর্ণা আলুলায়িত-কুন্তলে-অনাবৃতবক্ষ-অর্দ্ধআবৃত, উন্মাদিনী-প্রায় রমণী প্রসারিত হস্তের তর্জ্জনী তৈমুরের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"তুমিই কি সেই খঞ্জ যে সুলতান বৈয়াজিৎকে পরাভূত করিয়াছে?"

"হাঁ আমিই সেই, অনেককে পরাভূত করিয়াছি—এখনও ক্লান্ত হই নাই। কিন্তু, তুমি কে, রমণি!"

"শোন, তুমি অনেক কিছু করিয়াছ, কিন্তু তুমি পুরুষমাত্র, আমি মাতা। তুমি মৃত্যুর অনুচর, আমি জীবনের সহচরী। তুমি আমার নিকট অপরাধী, আমি সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তোমার কাছে দাবী করিতে আসিয়াছি। আমি শুনিয়াছি তোমার মন্ত্র—'ন্যায় বিচারই শক্তির প্রস্রবণ' - আমি সে কথা বিশ্বাস করি না; তথাপি আমি মাতা, আমার প্রতি ন্যায় বিচার কর।"

তৈমুর রমণীর কথার ভিতর প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা অনুভব করিলেও বলিলেন—"বস, তোমার কথা আমি শুনিব।"

রমণী সেই রাজন্যগণের সঙ্গে এক-আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি বহুদূর হইতে আসিতেছি—সে কতদূর তুমি বুঝিবে না। আমার স্বামী একজন ধীবর—সুন্দর, সরল, সুখী। আমি তাঁহাকে সুখী করিয়াছিলাম! আমার এক সন্তান ছিল—তেমন সন্তান পৃথিবীতে কাহারও জন্মায় নাই—"

"আমার জাহাঙ্গীরের মত"—তৈমুর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন।

"—আমার পুত্রের বয়স যখন ছয় বৎসর, জলদস্যুগণ তাহাকে

"আমি তৈমুর—আর না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না—আমি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মৃত্যুর খোরাক নষ্ট করিয়া, নিজ হস্তে রক্তের নদী বহাইয়াছি—যে হেতু মৃত্যু আমার হৃদয়ের আলো নিভাইয়া দিয়াছে, আমার জাহাঙ্গীরকে গ্রাস করিয়াছে। মানুষের মূল্য কিছু নাই, রাজ্যের মূল্য কিছু নাই—আমার ন্যায় খঞ্জ, মানুষের মুণ্ডপাত করিয়াছে, ধরিত্রীকে পদানত করিয়াছে—কিন্তু আজ আমার যাহা মনে হইতেছে তাহা নূতন, একান্ত অভিনব! এই ক্ষুদ্র রমণী আমার সম্মুখে বসিয়া আমাকে হুকুম করিতেছে—তাহার পুত্রকে ফিরাইয়া দিতে বলিতেছে—যেন সে আমার সমকক্ষ বা আমার প্রভু! এ শক্তি সে কোথায় পাইল! সে স্নেহময়ী মাতা—কল্যাণময় পুত্রের জননী; সে পুত্র হয় ত একদিন পৃথিবীর সকল দুঃখ মোচন করিয়া আনন্দস্রোতে ধরিত্রীকে প্লাবিত করিবে—আমার জাহাঙ্গীর বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাহাই করিত—আমি মাত্র নরশোণিতে মৃত্তিকা অভিসিঞ্চিত করিয়া তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছি—কিন্তু কিছু রোপণ করি নাই—কি জন্মিবে এই উর্ব্বর মরুভূমি বক্ষে?

পার্শ্বচরগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"যাও জনে জনে, দিকে দিকে—জননীর সন্তানকে খুঁজিয়া আন; যে আনিবে তাহাকে রাজ্য দিব—মাতা তিষ্ঠ—তোমার পুত্রকে আনিয়া দিব!" এই বলিয়া ভয়ঙ্কর তৈমুর শিশুর মত মাথা নত করিল। মাতা হাসিলেন—সকলে হাসিল—জননীকে দেখিয়া শিশু যেমন হাসে তেমনি হাসিল। জননীরূপিণী নারী জয়যুক্ত হও!

৬ই আশ্বিন, ১৩৩৪

ইতি